জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১৫ ।।
মৃদুল কুমার বাগচী স্মৃতি পুথিমালা ২

কেমন আছ মণিপুর

সুবীর ভৌমিক

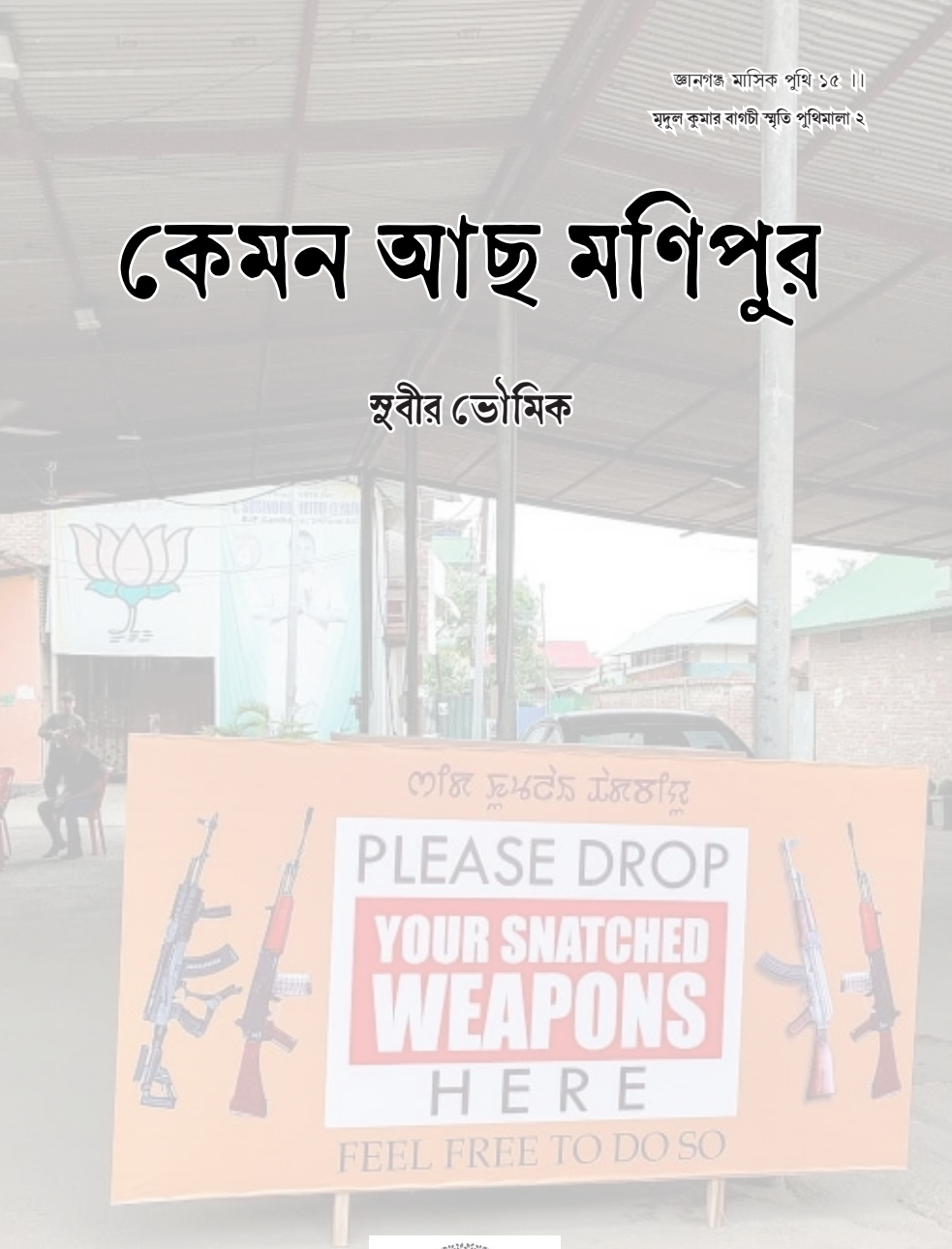

জ্ঞানগঞ্জ,
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

মৃদুল কুমার বাগচী স্মৃতি পুথিমালা
কেমন আছে মণিপুর
সুবীর ভৌমিক

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৫০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

কেমন আছে মণিপুর

আরামবাই টেঙ্গোলে মেইতেই মিলিশিয়া। তারা মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী, বীরেন সিং এবং রাজ্যসভার সাংসদ, লেইশেম্বা সানাজাওবা সহ ভারতীয় জনতা পার্টির বড় নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা উপভোগ করা 'মেইতেই' জাতিবাদী সংগঠন; মণিপুরের প্রতিটি শহরে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করে, বাড়ির মধ্যে থেকে টেনে বার করে শত্রু জনজাতি কুকিদের হত্যাও করে; প্রশাসন নির্বিকার। বছর ঘুরতে চলল, এই রক্তস্নাত মৃত্যু-উপত্যকা নিয়ে এখনও দিল্লিকেন্দ্রিক নিউজ মিডিয়ায় শ্মশানের নিস্তব্ধতা। বিষ্ণুপুর জেলার কোয়াকতায় গত বছরের ১০ই জুলাই মেইতেই পাঙ্গাল বুদ্ধিজীবী ফোরামের একটি প্রতিবাদ সভায় বক্তাদের প্রাথমিক দাবি ছিল রাজ্যজুড়ে চলতে থাকা হিংসা বন্ধ করা। সে কথায় যদিও রাজনৈতিক সংঘর্ষে ব্যবহার হতে চাওয়া জনতা কান দেয়নি।

গত দেড় বছর ধরে চলতে থাকা সংঘাত শুরু হওয়ার ত্রিশ বছর আগে, ৩রা মে থেকে ৫ই মে ১৯৯৩ এর মধ্যে চলতে থাকা সংঘর্ষের পর, মেইতেই জনতা রাজ্যজুড়ে এক শতাধিক পাঙ্গালকে হত্যা করে। প্রায়শই মেইতেইদের অপরাধী এবং অবৈধ অভিবাসী হিসাবে স্টিরিওটাইপ করা হয়েছে, এবং তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল দখলের অভিযোগ আনা হয়েছে। ২০১৮ সালে, বীরেন সিং সরকার একটি জঙ্গলে প্রায় চারশত পাঙ্গালের বাড়ি ভেঙে দেয়, যেখানে তারা ১৯৭০ সাল থেকে বসবাস করছিলেন। মণিপুর কনজারভেশন অফ প্যাডি ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড অ্যাক্ট-এর জারি করে সরকার কৃষি জমি থেকে পাঙ্গালবাসীদের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল, এবং সেখানে রাজ্যের বিধায়কদের জন্য আবাসনও তৈরি করতে চেয়েছিল - যদিও ধানজমিতে মেইতেই বসতিগুলি বেশিরভাগই তারা পরিকল্পনা করে হাত দেয় নি। আগের বছর হিংসা শুরুর সময়ে, কোয়াকতার পাঙ্গালরা পার্শ্ববর্তী চূড়াচাঁদপুর জেলায় মেইতেইদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল। অঞ্চলের জনৈক মুসলিম বাসিন্দা, যার মা প্রায় একশত মেইতেইকে বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিলেন, সংবাদসংস্থা আল জাজিরাকে বলেছেন, তিনি যখন কুকি সহকর্মীর গাড়ি উদ্ধার করতে ইম্ফলে গিয়েছিলেন, তখন মেইতেইদের একটি দল তাকে লাঞ্ছিত করে।

মিডিয়া যখন মেইতেইদের পক্ষে দাঁড়ায়; তারা যখন পক্ষপাতদুষ্ট, উস্কানিমূলক খবর করে; উপত্যকার শক্তিশালী রাজনীতিবিদরা যখন তাদের হাতের মুঠোয়; তখন আদৌ কি কোনও দিন এই হিংসা শেষ হবে, বড় প্রশ্ন এটাই। মণিপুর হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে মেইতেইদের তফসিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দীর্ঘস্থায়ী দাবিকে ত্বরান্বিত করার নির্দেশের পর রাজনৈতিক হিংসার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এবং, এই আইনি আদেশকে কুকিদের বিরুদ্ধে মৈইতিদের খেপিয়ে তোলার জন্য বীরেন সিং সরকার সমন্বিত প্রচারের মধ্যে যে রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করেন, তাতে রাজ্য জুড়ে বিপুল হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্য

সরকারের পুলিশ হিংসা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী, আসাম রাইফেলস এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ১৪৪টি কোম্পানি পাহাড়ের বাসিন্দা মেইতেইদের এবং উপত্যকায় বাসকরা অন্য পরম্পরার সমাজের মানুষোদের ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি বাস্তুচ্যুত মানুষ বর্তমানে গোটা মণিপুর রাজ্যের ত্রাণ শিবিরগুলোয় রয়েছে। ত্রাণশিবিরগুলোর চরম অব্যবস্থাপনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রাজ্য সরকারের গাছাড়া মনোভাব। শিবিরগুলোয় খাবার বা স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতির স্পষ্ট অভিযোগ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের পক্ষে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েও সুরাহা হয় নি। আরও বারো হাজার মানুষ প্রতিবেশী মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছেন, তিন হাজার জনতাকে অন্য রাজ্যে বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সমস্যা হল উপদ্রুত এলাকা থেকে পীড়িত মানুষদের ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া, সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাহিনী হিংসা রুখতে চরম ব্যর্থ। মৃতের সংখ্যা কয়েকশো ছাড়িয়েছে, যাদের অধিকাংশই কুকি। তিন শতাধিক কুকি গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মেইতেই জনতা ইম্ফলের প্রায় সমস্ত কুকি সম্পত্তি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। সৈন্যরা পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে লুট হওয়া অস্ত্র আজও উদ্ধার করতে পারেনি। এই তথ্য থেকে স্পষ্ট পুলিশ কি আদৌ চায়, যে লুঠ হওয়া অস্ত্র তাদের হাতে ফিরে আসুক? সাংবাদিক সুমির কাউলের সাথে কথা বলা নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মতে, বর্তমানে লুঠ হওয়া অস্ত্রের মধ্যে প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ অস্ত্র এবং ছয় লাখেরও বেশি গুলি আজও নিখোঁজ। বিপুল গোলাবারুদও জমে আছে মেইতেই মিলিশিয়ার হাতে। এই মুহূর্তে, কেন্দ্রীয় বাহিনী পাহাড় এবং উপত্যকার মধ্যে 'বাফার জোন' প্রতিষ্ঠার কাজের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছে - এবং প্রায়শই ব্যর্থ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে। নরেন্দ্র মোদি সরকার অবিচল রয়েছে বীরেন সিং-এর সমর্থনে, সংঘাতকে উস্কে দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তার পক্ষপাতমূলক ভূমিকা নিয়ে টুঁ শব্দ করতে নারাজ। মণিপুর প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদির প্রথম বিবৃতি ২০শে জুলাই এসেছিল, হিংসা শুরু হওয়ার প্রায় আশি দিন পরে। কুকি মহিলাদের ভিডিও নিয়ে তৎকালীন ক্ষোভের কারণে তিনি কথা বলতে বাধ্য হন, বিরোধীরা এই বিষয়ে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন বানচাল করার হুমকি দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি কুকি মহিলাদের যৌন নিপীড়নের জন্য যে ব্যথা এবং ক্ষোভ অনুভব করেছেন, তা প্রকাশ করার পরেও মণিপুর এবং কংগ্রেস শাসিত দুটি রাজ্যের মধ্যে একটি ঘৃণ্য সমতুলনা তৈরি করেছিলেন। 'বিশেষ করে আমাদের মা ও বোনদের সুরক্ষার জন্য, তাদের কঠোরতম পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, ঘটনা যেখানেই ঘটুক না কেন, রাজস্থান বা ছত্তিশগড় বা মণিপুরে', বলেই তিনি দায় সেরেছেন।

ফলে মণিপুরে হিংসার আগুন আঁচ কমার এতটুকুও লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে না। ১২ই জুন, ২০২৪, টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন জানাচ্ছে, মণিপুরের চার আরএসএস প্রশিক্ষণ শিবিরের স্নাতক জানিয়েছে রাজ্যে জাতিসংঘাত নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন।

৯৩৬ স্বেচ্ছাসেবক, যারা সঙ্ঘের কার্যকর্তা বিকাশবর্গ সংগঠনের প্রশিক্ষণের চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করেছে, তাদের মধ্যে পাঁচজন উত্তর-পূর্ব রাজ্য মণিপুর থেকে। ফলে আরএসএস সরসঙ্ঘচালক (প্রধান), মোহন ভাগবত হিংসা থামাতে না পারলেও, সঙ্গঠনের মধ্যে উদ্বেগের কণ্ঠস্বরের প্রভাব তাকে বাধ্য করেছে প্রকাশ্যে ফোঁস করতে; হিংসার দেড় বছর পর তাঁকে উদ্বিগ্ন হয়ে মণিপুরের হিংসা নিয়ে কথা বলতে দেখা-শোনা গেল। এই সম্পাদকীয় লেখার মাস দুয়েক আগে, ভোটের ঠিক পরে পরেই তিনি বলেছিলেন মণিপুর জ্বলছে; সরকারের উচিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধান করা। 'উত্তর-পূর্ব সবসময় সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে। অবশ্যই, যারা মণিপুর থেকে এসেছেন তারা তাদের রাজ্যে চলমান সংঘর্ষ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা কুকি এবং মেইতেইদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিভাজনের কথা আমাদের জানাচ্ছিল। দুই জনজাতি একে অপরের এলাকায় প্রবেশ করছে না এবং সামাজিক বন্ধন ছিঁড়ে গিয়েছে' - বলছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে থাকা আরএসএস কর্মকতা সুনীল কিটকারু। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, উত্তর-পূর্বে আরএসএস বহুকাল ধরে অতিমাত্রায় সক্রিয়, তাদের পরিধি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে প্রতিদিন। আসামে, সংগঠনের ১০০০ শাখা (ইউনিট) রয়েছে, মণিপুরে আরএসএসের প্রায় শতাধিক শাখা রয়েছে এবং সেখানে সংঘের উপস্থিতি বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

পুথি ছাপতে যাওয়ার মুহূর্তে দেখতে পেলাম ১ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কুকি-মেইতেই দ্বন্দ্ব মেটাতে মধ্যস্থতাকারী' শীর্ষক। নিজস্ব সংবাদদাতা লিখছেন,

'আর ৬ মাসের মধ্যে মণিপুরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ। তিনি সাংবাদিকদের জানান কুকি ও মেইতেই নেতাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন ও সমঝোতার উদ্দেশ্যে এই প্রথম মধ্যস্থাকারী নিয়োগ করা হয়েছে। নাগা বিধায়ক তথা হিল এরিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ডাইনাগাংলুং গাংমেই। এর আগে কুকি-জো-দের সঙ্গে কথা বলেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালডুহোমা।

অবশ্য পৃথক প্রশাসনের দাবিতে কুকি জনগোষ্ঠী আজ মণিপুরে ও দিল্লিতে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল ও সভার আয়োজন করে। অংশ নেন হাজার হাজার মানুষ। চূড়াচাঁদপুর, লেইসাং, কাংপোকপির কেইথেলমানবি, টেংনাওপালের মোরেতে কুকি-জেমিদের মিছিল বেরোয়। চূড়াচাঁদপুরের মিছিল চলে ৬ কিলোমিটার। স্বরাষ্ট্র কমিশনার এন অশোক কুমার আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যে কোথাও শনিবার অফিস, স্কুল, দোকানপাট বন্ধ রাখা চলবে না। কিন্তু কুকি এলাকায় সব বন্ধ ছিল।

প্রতিবাদ মিছিলের পরে জেলাশাসকের হাতে পৃথক প্রশাসনের দাবিপত্র তুলে দেয় প্রতিবাদকারীরা। দিল্লির যন্তরমন্তরেও কুকিদের প্রতিবাদ সভা হয়। পেনিয়েল গ্রামে বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্রের বাড়িতেও এ দিন আক্রমণ হয়।

এদিকে নাগা এলাকার সদর হিলে নাগারা নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নির্দেশ দিলেও সেখানে

কুকিদের প্রতিবাদে বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছড়ায়।

এই পরিস্থিতিতে বীরেন বলেন, 'আলোচনাই সমস্যা সমাধানের রাস্তা। আমার আশা মধ্যস্থতার মাধ্যমে ও কেন্দ্রের সহযোগিতায় ৫-৬ মাসের মধ্যেই শান্তি ফিরবে রাজ্যে।' তিনি যে কোনওভাবেই পদত্যাগ করবেন না, তাও স্পষ্ট করে দেন বীরেণ।

সুবীর ভৌমিকের কাছে চর্চা দল কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি এই অঞ্চলে ঐতিহাসিকতা, ভৌগলিকতা, এবং কৌমগোষ্ঠীগুলির অন্তর্বর্তী সমাজব্যবস্থাকে হাতের তালুর মত চেনেন। এই পুস্তিকাটিই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। তার 'ট্রাবলড পেরিফেরি: ক্রাইসিস অফ ইন্ডিয়াস নর্থ ইস্ট' বইতে তিনি নিজেই জানান দিয়েছিলেন- গোলকায়ন পরবর্তী ভারতের জনপ্রিয়তম সাংস্কৃতিক আইকন শাহরুখ খান তার বলিউডি প্রকল্পনা 'চক দে ইন্ডিয়া'-তে মণিপুরের মেয়েদের পাঞ্জাবি শেখার 'ব্যর্থতা' নিয়ে খোঁটা দিয়ে তাদের জোর করে হিন্দিকেন্দ্রিক 'ভারতীয়ত্বে'র তথাকথিত মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করানোর উদ্যম নেন। সভ্যতার বিকশের জন্য আমাদের ব্রহ্মপুত্রের প্রয়োজন যেমন, গোদাবরী এবং কাবেরিদেরও তেমনি একইভাবেই প্রয়োজন। ভারত রাষ্ট্র শুধুই 'গঙ্গা মাইয়ার' সন্তান, আমরা যারা হিন্দি বলয়ের বাইরে থাকি তাদের এই কথা বার বার শুনতে হয়। 'হিন্দু, হিন্দি'কে ঘিরে কল্পনা করা জাতীয় মূলধারার ভুল ধারণায় 'দেশ' বিকশিত হতে পারে না। উত্তর-পূর্ব এবং কাশ্মীরের মতো অন্যান্য সমস্যা আরও বাড়বে এবং তারা আরো বিচ্ছিন্ন হবে। ভারত বহু জাতি, ধর্ম, ভাষা সংস্কৃতি, পরিচয়ের বহুবিধতা নির্মিত জাতিরাষ্ট্র কাঠামো। প্রাক-উপনিবেশিক অস্তিত্বের ঘটমানতা আজও আমাদের উত্তর-উপনিবেশিক জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে। উত্তর-পূর্বের মানুষের ভাষা, জাতিসত্তা এবং ধর্ম পরিচয়ের পারস্পরিকভাবে সমর্থন করেই বৃহত্তর জাতীয় পরিচয়ের সাথে সভ্যতা এবং বহু-সাংস্কৃতিক, সহনশীল এবং বৈচিত্র্যমুখী সম্পর্ক তৈরি করা যায়। নয়তো, রাজনৈতিক শক্তির ক্রমবর্ধমান অপরাধীকরণ এবং এক জাতিগোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে। 'ফ্রিডম ফিগার' প্রতিস্থাপিত হবে 'যুদ্ধবাজ' দ্বারা। ড্রাগমাফিয়ার দৌরাত্ম, অস্ত্রবিক্রেতার রাজনৈতিক চক্র ও সাধারণ জনতার বলপূর্বক সামরিকীকরণের বিরুদ্ধেই সুবীর ভৌমিকের রাজনৈতিক-আকাদেমিক অবস্থান। তার বয়ানে উত্তর-পূর্বকে দেখা অনন্য অভিজ্ঞতা, যার হাত ধরে আমরা মণিপুরের জন্য শান্তিবার্তা প্রেরণ করতেই পারি।

ধন্যবাদান্তে,

অত্রি ভট্টাচার্য

জ্ঞানগঞ্জ [উপনিবেশবিরোধী চর্চা কর্পোরেট বিরোধী চর্চা] র পক্ষে

ডবল ইঞ্জিন মণিপুর

২০২৩এর মে মাস থেকে মণিপুরে শুরু হওয়া ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা যে মেইতেই আধিপত্যবাদী রাজনীতির প্রতিফল, এ কথা বললেও ভুল হয় না। সেই পরিস্থিতিকে স্পষ্টভাবে নাগা আর জো (জো (Zo) সম্প্রদায় [কুকি-চিন-মিজো সমাজ নামেও পরিচিত] কুকি-চিন ভাষী সমাজ বোঝায়; তাঁদের বাস মূলত উত্তর-পূর্ব ভারত, পশ্চিম মায়ানমার এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক নীতি জাতিগত ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ না করে, রাজনৈতিক ভিত্তিতে সীমানা তৈরি করেছে) উভয় সম্প্রদায়ের পরিচয়ের জাতিসত্ত্বা দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করছে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার নাগা সমাজকে যুদ্ধবিরতিতে (ভারত সরকার এবং এনএসসিএন-এর মধ্যে ১৯৯৭ থেকে কার্যকর) রাজি করালে ইম্ফল উপত্যকায় ক্ষুব্ধ মেইতেইদের মনে হয়েছিল, নাগাদের জনপ্রিয় দাবি অনুযায়ী 'বৃহত্তর নাগালিম' রাজ্য তৈরির প্রকল্পে মণিপুর রাজ্যের বড় অংশ নাগাল্যান্ডের সাথে জুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হল। এই চুক্তির প্রতিবাদে মেইতেইরা সরকারি সম্পত্তিতে হামলা চালায়, এমনকী রাজ্য বিধানসভার একাংশ পুড়িয়েও দেয়। কিন্তু নাগা সমাজ মেইতেইদের বুঝিয়ে হিংসা থেকে নিবৃত্ত করে। সাম্প্রতিককালে কুকি সমাজের আলাদা প্রশাসনিক অঞ্চল দাবির প্রেক্ষিতে ২০২৩এর ১ মে থেকে মেইতেইরা কুকিদের ওপর হিংস্র আক্রমন নামিয়ে এনেছে।

আজকে মণিপুরে যে সংকট তৈরি হয়েছে, সেই সংকটের পিছনে যেমন উপযুক্ত কারণ রয়েছে, তেমনি হিংসা-বন্দুকের ঘোড়াও বিভিন্ন পর্বে উদ্দেশ্যপূর্বভাবে টানা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। খুব সরলভাবে বললে এই গোলোযোগের উৎস হল দীর্ঘকালের মেইতেই আর (জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের কিছু বেশি, অধিকাংশ বৈষ্ণব, ইম্ফল উপত্যকার আশেপাশে বাস, মোট জমির ১০%র নিয়ন্ত্রক) কুকি জনসত্ত্বার (জনসংখ্যার ২৫%, অধিকাংশ খ্রিষ্টধর্ম অনুগামী এবং মণিপুরের অধিকাংশ পাহাড়ি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করা) মধ্যে তৈরি হওয়া অতলস্পর্শী ফাটল।

সাম্প্রতিক ধাক্কাটা এসেছিল মণিপুরের ইম্ফল হাইকোর্টের রায়ে। বিচারপতি মুরলিধরণ মণিপুর সরকারকে নির্দেশ দিলেন এক মাসের মধ্যে মৈতেইদের তফশিলি আদিবাসী বা শিডিউলড ট্রাইব ঘোষণা করতে হবে। কুকিদের বিরুদ্ধে লড়াইএর হাতিয়ার হিসেবে মেইতেইদের এটা অন্যতম বড় দাবি ছিল। এর ফল হল রাজ্যব্যাপী হিংসা। হিংসা থামাতে হাইকোর্ট ২০২৪ তার নিজের রায় বাতিল করলেও রাজ্যে হিংসা আজও কিন্তু থামে নি।

মৈতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরিচালিত মণিপুর রাজ্যের সরকার, পাহাড়ি জঙ্গলে মায়ানমার থেকে আসা 'অবৈধ' উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে এবং পাহাড়ি ভূমিতে পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকিতে উদ্বিগ্ন কুকিদের প্রতিক্রিয়াও এই হিংসার অন্যতম ইন্ধন

বলে মনে করা হয়।

এত সব সত্ত্বেও মণিপুরে সাম্প্রতিককালে হিংসক ঘটনার পিছনের ঘটে যাওয়ার কারন, ধাক্কা বা ইতিহাস সব কথা বয়ান করে না। বর্তমানে আমরা মণিপুরে যে বিস্ফোরক অবস্থা দেখছি, সেটা ঘটেছে বহু ঘটনাক্রম মিলিয়ে মিশিয়ে বহুকাল ধরে বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি হওয়ার ফলে। রাজ্য জুড়ে বিদ্বেষের রাজনীতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্বেগকে তুঙ্গে তুলে পারস্পরিক অবিশ্বাসের আবহাওয়া তৈরি করেছে। পাশাপাশি বাস করা সম্প্রদায়গুলোর হৃদয়জুড়ে গরলের স্তরের বিপজ্জনক বাড়বৃদ্ধির সংকেত দূরের মানুষ খুব সহজে বোঝেও না, পরিমাপও করতে পারে না। হঠাতই আমাদের সক্কলকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে, বিষম চমক তৈরি করে, এই সব মেলানো মেশানো গরল উথলে উঠে হিংসায় রূপান্তরিত হল মণিপুরজোড়া পাশাপাশি বাস করা সমাজ আর রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। দেড়বছর ধরে যে নিষ্করুণ হিংসা মণিপুর পুড়িয়ে ছারখার করছে, সরকার বুঝতেই পারছে না প্রবল হিংসা দমনে তার কী করা উচিৎ। মণিপুর বহুকাল ধরেই খুবই সংবেদনশীল অঞ্চল, সংবেদনশীল রাজ্য, তার অধিকাংশ প্রতিবেশী রাজ্য, রাষ্ট্র তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে না। ফলে এই অঞ্চলের এই ধরণের এক রাজ্যে রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে পড়ার ঘটনা প্রত্যেক নাগরিকের শঙ্কার কারণ হওয়া উচিত ছিল। সেই হিংসার প্রতিঘাত ভারতজুড়ে যে ধরণের হওয়া দরকার ছিল, দুর্ভাগ্যবশত সেটা হয় নি।

২৯ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত রাজ্য, কেন্দ্রিয় দপ্তরের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করতে মণিপুরে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একই সময়ে সেনা প্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে মণিপুর সফর করছিলেন। সমস্যার গভীরতা বোঝাগেল হাইপ্রোফাইল রাষ্ট্রনেতা এবং সর্বোচ্চ সামরিক আমলার রাজ্যে সরব যৌথ উপস্থিতিতেও হিংসার প্রকোপ কমল তো নাই বরং কোথাও কোথাও তুঙ্গে উঠল। আগামী দিনে আরও বিশদে আলোচনা হওয়া উচিৎ, কোন প্রক্রিয়ায়, প্রথমবার ক্ষমতায় আসা ভাজপার নেতৃত্বের মণিপুর সরকার, রাজ্যকে এই দুঃখজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ঠেলে দিতে পারল। সরকারের একের পর ভুল পদক্ষেপ, অধিকাংশ সময়ে জরুরি প্রয়োজনেও উপযুক্ত পদক্ষেপ না করার জন্যে মৈতেই-কুকি দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণের রেশ আজ আর সরকারের হাতে নেই। অসহায় রাজ্য সরকার দ্বন্দ্ব মেটাতে তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ করছে।

তবুও, সামগ্রিক জাতির কৌম বিবেকের থেকে মণিপুরের মানসিক দূরত্ব, মূল ভূখণ্ড থেকে তার ভৌগোলিক দূরত্ব এতটাই অনতিক্রম্য যে, ভারতের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এই রাজ্যে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা লেলিহান আর বিপর্যয় যখন রাজ্যের জনজীবন ছারখার করে দিচ্ছে, সেই সকরুণ বাস্তবতা সামগ্রিক জাতির মনে থানা গেড়ে বসতে বহু সময় নিয়েছে। হিংসা শুরু হওয়ার বহু পরে ভারতজোড়া নাগরিক সমাজ কড়া বিবৃতি জারি করে, বিজেপির তথাকথিত 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে আহ্বান জানিয়ে বলেছে 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে খারাপ ঘটনা হল কুকিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মেইতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীগুলি স্পষ্টভাবে হিংসা নামিয়ে আনা... একই সঙ্গে তারা গণহত্যা চালানোর মত আধিপত্যবাদী ঘৃণাজাগানোর-বক্তৃতা প্রচার করেছে এবং সামগ্রিক ঘটনা থেকে নিজেদের দায়মুক্তির কথাও জানিয়েছে।'

রাজ্যে হিংসার প্রকোপ বুঝতে সফররত দুই কংগ্রেস সাংসদের অভিজ্ঞতা আরও করুন। তাঁরা নিজেদের পরিচিয়ে ঘুরতে পারেন নি, বরং তাদের ঘুরতে ছদ্মবেশ নিয়ে নিজেদের পরিচয় লুকোতে হয়েছে, 'এমন একটি অঞ্চলে যেখানে পরিচয় আর আদর্শ মানবতাকে ধ্বংস করে ঘৃণা, হিংসা, রক্তপাত এবং হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত করেছে...।'

১০টা বিরোধী দল যৌথ বিবৃতিতে মণিপুরের হিংসা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এমন কী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ রাজ্যজুড়ে বিপর্যয় আর দুর্দশায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংঘের সাধারণ সম্পাদক, দত্তাত্রেয় হোসাবালে বলেছেন, 'মণিপুরে ৪৫ দিন ধরে চলা হিংসা উদ্বেগজনক।'

সে সময়ের অবস্থা সত্যিই উদ্বেগজনক ছিল, অস্বীকার করার উপায় নেই। এই ব্যাপক হিংসা এমন এক রাজ্যে ঘটল, যে রাজ্য কেন্দ্রিয় সরকারের Department of Administrative Reforms and Public Grievances দপ্তরের সমীক্ষায় ২০২০-২১এর সুশাসন সূচকে দুর্বলতম রাজ্য হিসেবে প্রকাশ্যেই চিহ্নিত। রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'অন্যদিকে মণিপুর, ২০১৯এ নেতিবাচক উন্নয়নের তালিকায় থাকা উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর মধ্যে, পতনের সূচকে সবার আগে -১১.২ শতাংশ।' ফলে রাজ্য যে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে বিষয়ে বিতর্ক ওঠার নতুন করে সুযোগ নেই। এই সংকটময় সময়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে, হিংসার শৃঙ্খল ঠেকাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত সমর্থন ও সাহায্য দেওয়ার জন্য সমস্ত পক্ষের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ হোক।

আমি জানি ক্ষত সারতে আরও অনেক অনেক সময় লাগবে, তবুও বলি, অন্তহীন ঢালে গড়িয়ে যেতে থাকা রাষ্ট্রীয় নীতি বিকৃতির অপ্রত্যাশিত পরিণতি সম্পর্কে মণিপুরের চলতি ঘটনাবলী আমাদের সতর্ক করে বলুক, ক্ষমতায় থাকা মানুষেরা মনে করে, জনগণের একাংশকে খেপিয়ে তুলেই সংগঠনের পূর্বনির্ধারিত এজেন্ডা সফল করার মাধ্যমে রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব। আমাদের অনেকেরই ভ্রান্ত বিশ্বাস, সুস্থ গণতান্ত্রিক বিতর্ক নির্ভর করে, পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে, বিভিন্ন সমাজের আত্মীকরণ ঘটিয়ে, এমন কী স্পেস তৈরি করার মাধ্যমে জাতি নির্মিতির বদলে রাষ্ট্র-যন্ত্র ব্যবহার করে দখলদারি, সংকীর্ণ এজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়া তুলনামূলকভাবে অনেকটাই সহজ কাজ। বলা দরকার এই পদ্ধতি প্রয়োগে দুর্যোগ ছাড়া অন্য কিছুই বয়ে আনতে পারে না।

যে ধরণের ক্ষমার অযোগ্য হিংসা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে মহিলাদের ওপরে, সেটা অভূতপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না। সামাজিক মাধ্যমে প্রায় প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে যাওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে দুই বিবস্ত্রা নারীকে রাস্তায় সর্বসমক্ষে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে এক দল মানুষ। আশ্চর্যের বিষয় হল মহিলা দুজনের একজন কারগিলে যুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রবীণ সেনানীর স্ত্রী। সেই মহিলাদের ওপর গণধর্ষণ চাপানো হল। বোধহয় এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাই সর্ব প্রথম মণিপুরের হিংসা নিয়ে জাতির বিবেককে জাগিয়ে তুলতে বাধ্য করেছে।

যে 'এক্ট ইস্ট' নীতিতে ভারত, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় ভূখণ্ডে সহজে পৌঁছতে চাইছে, মণিপুরে রাষ্ট্রীয় সুশাসন দেওয়ার ব্যর্থতা সেই নীতি

সফলভাবে রূপায়ন করার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। মাথায় রাখতে হবে মহিলাদের স্বাভাবিক অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের ওপর গণধর্ষণ চাপিয়ে দেওয়া ঘৃণ্য দুষ্কৃতিরা গ্রেফতার হল ভিডিওটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ারও কয়েক সপ্তাহ পর। এই ঘটনাক্রম থেকে প্রমান হয় না যে মণিপুরে রাষ্ট্র কাঠামো সার্বিকভাবে ব্যর্থ এবং সর্বোচ্চ স্তর থেকে জারি করা নির্দেশ সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছে দিয়ে পালন করানোর থাকবন্দী মণিপুরে স্রেফ উবে গিয়েছিল?

মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেন অত্যাচারিতরা রাজ্যজুড়ে ৬০০০ এফআইআর করেছেন, তার পক্ষে কোনও একটা গণধর্ষণ বা যৌন হেনস্থার মামলা নিয়ে মন্তব্য করা সমীচিন নয় - তখন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং প্রকাশ্যেই হিংসা চাপানোর মাত্রাকে স্বীকৃতি দিয়ে, কেন্দ্র রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকারের হিংসা থামানোর ব্যর্থতাকেই মান্যতা দেন।

এই ধরণের হিংসায় পুলিশে শুধু দর্শক হয়েই থাকে নি - জনসমষ্টি যেভাবে দুই মহিলাকে পুলিশের থেকে ছিনিয়ে নিল, সেই ঘটনাক্রমে মনে হয় পুলিশ তৈরিই ছিল দুষ্কৃতিদের মদত জোগাতে। তারা যেন হিংস্র জনগণের হাতে দুই মহিলাকে বিনা বাধায় তুলে দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মণিপুরজোড়া পুলিশ বাহিনী জাতিগত আবেগে আক্রান্ত হয়ে হিংস্রতার চক্রের সাথে প্রথম থেকেই নিজেদের জড়িয়ে নিতে চেয়েছিল এ তথ্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট না হয়ে যায় না; মাথায় রাখতে হবে পুলিশের বয়ান ছিল তাদের প্রায় ৫০০০ রাইফেল দাঙ্গাকারীরা ছিনিয়েছে, বাস্তবতা হল পুলিশ এই রাইফেল দাঙ্গাকারীদের হাতে তুলে দিয়েছিল, এগুলি লুঠ হয়নি।

পুলিশের হাত বদল করা অস্ত্র নিয়ে, আরামবাই টেঙ্গোলের মতো বিজেপি-সমর্থিত বেসরকারি সেনা, মিলিশিয়া বাহিনী চালানো ব্যক্তি এখন মেইতেই এবং কুকিসহ ভিন্নমত এবং বিরোধীপক্ষ, উভয়ের উপর মেইতেই আধিপত্যবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। ঠিক এই বিষয়টা বুঝে মণিপুর রাজ্যের সম্ভাব্য ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে সমস্ত আইনপ্রণেতা এক বিবৃতি জারি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেকের ধারণা মণিপুরের হিংসা তৈরি করা হল বিজেপি বিরোধী রাজ্যগুলোকে বেসরকারি সেনাবাহিনী দিয়ে শাসন করার উদ্দেশ্যে বিজেপি-আরএসএসের সুচিন্তিত পরিকল্পনার পাইলট প্রকল্প হিসেবে। সম্ভবত আগামী দিনে অবসরপ্রাপ্ত অগ্নিবীর সৈনিকদের নিয়ে এই ধরণের বেসরকারি সেনাবাহিনী চালানোর ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছে তারা - যে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কার্যকরী গণতন্ত্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান অর্থহীন হয়ে যেতে সময় নেবে না।

অতীতে, মণিপুর সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানান অঞ্চলে শুধুমাত্র স্বয়ংক্রিয় শস্ত্রে সজ্জিত বিদ্রোহীরা মাঝে মধ্যেই প্রান্ত অঞ্চলের থানা থেকে অস্ত্র লুঠ করেছে। মে মাস থেকে শুরু হওয়া হিংস্রতা, এই ধরনের বিদ্রোহী অভিযান ছিল না, এই সাধারণ তথ্যটা মনে রাখা দরকার। হাজার হাজারে পুলিশ সদস্যর অস্ত্র দুষ্কৃতি দলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিকল্পনা সফল করতে। কাজ শেষ হওয়ার পর পুলিশই ড্রপ বক্স তৈরি করে, খুনি, অত্যাচারী জনসমষ্টির হাতে তুলে দেওয়া অস্ত্রগুলো ফেরত পাওয়ার মেকানিজম বানিয়েছে। ফলে, মণিপুর পুলিশের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র কঠোর, সুনির্দিষ্ট শাস্তিমূলক পদক্ষেপই জরুরি নয় (মূলত এসএইচও এবং অস্ত্রাগার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে) বরং গোটা বাহিনীকে বরখাস্তও করা দরকার (যেমনটি ২০০৯এর বিদ্রোহের পরে বাংলাদেশ রাইফেলসকে করা

হয়েছিল)। পুলিশকে গুরুতর দায়িত্ব অবহেলায় অভিযুক্ত করা তো দূরস্থান, তারা বর্তমানে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার নিরাপত্তা নিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংস্র অত্যাচার নামিয়ে আনা নিয়ে রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের জড়িত থাকার নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে চলছে।

সরকারি কাঠামোয় জুড়ে থাকা বহু প্রবীণ রাজনীতিবিদ আর নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে মাঝে রেখে পুলিশ, অস্ত্র হাত বদল করেছিল। এই দু'পক্ষের মধ্যে স্পষ্ট যোগসাজসের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে একটি ঘটনায় - যারা পুলিশের অস্ত্র নিয়ে হিংস্রতায় চাপিয়ে দিতে পথে নেমেছিল, দেখাগেল সেই দুষ্কৃতিরাই পদত্যাগপত্র ছিঁড়তে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে উপস্থিত হয়েছে। অনেকের ধারণা মুখ্যমন্ত্রীর বেআইনি কাজের জন্যে কেন্দ্র যাতে তাকে বরখাস্ত না করে, তার জন্যে শাসক দলের 'পাবলিক স্টান্ট'বাজি।

এই ঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠে আসে - মাত্র কয়েক হাজার মানুষের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কেন্দ্রিয় সরকারের সাম্প্রদায়িক মেইতেই নায়ক মুখ্যমন্ত্রী, যিনি তার ওপর অর্ষিত খুব সাধারণ সব সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম, তাকে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে কী 'সুশাসন' নামক এক নৈতিক প্রতিশ্রুতিকে আদৌ আর গুরুত্ব দেওয়ার দরকার আছে?

ত্রিপুরায় ১৯৮০তে বাঙালি উপজাতি দাঙ্গার শীর্ষ সময়ে কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিলের জন্য ষষ্ঠ তফসিল প্রয়োগ করে বিধানসভার প্রস্তাব গ্রহণ করার মাধ্যমে কেবল উপজাতি চরমপন্থীদের বিচ্ছিন্নই করেননি বরং তাদের প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত করে পৃথক টিপরাল্যান্ড (উপজাতীয় স্বদেশ) আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বন্ধুর রাজনৈতিক পথ পাড়ি দিয়েছিলেন।

মাথায় রাখা দরকার আসাম এবং মণিপুরে, শাসক সবর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিজাত নেতারা উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে প্রবল সন্দেহের চোখে দেখেছে। তাদের মনে হচ্ছে নাগাল্যান্ড মেঘালয়, মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশ সৃষ্টির পর এই স্বায়ত্বশাসন ব্যবহার হবে ভবিষ্যতের উপজাতীয় রাজ্যের তৈরির আন্দোলনের সূত্র হিসেবে। ত্রিপুরার অভিজ্ঞতা বলে উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহী উপজাতিদের রাষ্ট্রীয় অংশিদারে পরিণত করা যায়, রাজ্যের আঞ্চলিক ঐক্য বজায় রাখা যায় এবং এই মডেল উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেক জায়গাতেই অনুকরণ করা যেতে পারে।

মণিপুরে হিংসায় শুরুর সময়েই জরুরি ছিল বকেয়া পড়ে থাকা আন্তঃ-জাতিসত্ত্বা আলোচনা শুরু করা। সেই কাজে সরকার চরম ব্যর্থ হয়েছে। হিংসা দমনে ব্যর্থতার ফলে দ্বন্দ্ব সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে, কারন হিংস্র মনোভাব (সেটা বহু প্রচারিত ভিডিওতে দেখা গিয়েছে) শুধুমাত্র উভয় পক্ষের মানসিকতা আর প্রতিক্রিয়া একবগগা করেছে। কয়েকটা মেইতেই গোষ্ঠী ভারতের রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত হওয়া চুক্তি নতুন করে পর্যালোচনা করার হুমকি দিয়েছে (বিচ্ছিন্ন হওয়ার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত?)। অন্যদিকে কুকি গোষ্ঠীরা স্পষ্টভাবে রাজ্য সরকারের আওতা থেকে আলাদা হতে চেয়ে স্বাধীন প্রশাসনের দাবিতে

নতুন চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে।

হিংসাকে জায়েজ করতে, কুকিদের দুর্বৃত্ত প্রমান করতে এবং সরকারে প্রতিটি জাতিসত্ত্বার প্রবীণ অভিজ্ঞ মন্ত্রীদের কাছের আত্মীয়দের পোস্ত/আফিম চাষ এবং বর্মী ড্রাগ ব্যবসার দুষ্কর্ম লুকোতে, বহুল প্রচারিত 'পোস্ত/আফিম চাষ বিরোধী যুদ্ধের' প্রচারে বিপুল বাখান তৈরি করা হয়েছিল। বর্মী ড্রাগ মাফিয়া Zhang Zhi Ming, Lo Hsin Nian, the Wei brothersএর প্ররোচনায় আর প্রত্যক্ষ্য মদতে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক অঞ্চলে যে পোস্ত/আফিম চাষ চলে তাকে নির্মূল করতে চাষীদের ঠিকমত রোজগার দেওয়ার বিকল্প চাষ পরিকল্পনা তৈরি দরকার সরকারের। কিন্তু সরকার কী ড্রাগ আর নার্কো ব্যবসা রুখতে আদৌ উৎসাহী? তাহলে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী রাজনীতিবিদদের আত্মীয়দের পরিচালিত মণিপুরের ইটোচা ড্রাগ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, এবং বার্মিজজাত ড্রাগ বাজারজাতকরণের ভূমিকা তদন্ত করা হয়না কেন? আজ আর গোপন নেই, মণিপুরের 'কিরণ বেদী', থ. বৃন্দাকে পুলিশের চাকরি থেকে কেন পদত্যাগ করতে হয়েছিল? কারণ তিনি শীর্ষ ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিকের খুব কাছের আত্মীয়কে গ্রেফতার করতে চেয়েছিলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মণিপুরী অফিসার, লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিশিকান্ত সিং মনখারাপ করা টুইটে, সম্প্রতিক কালের মণিপুরকে 'রাষ্ট্রহীন' অঞ্চল বলেছেন; তার সখেদ বক্তব্য এই মণিপুরে 'মানুষের জীবন আর সম্পত্তি ইচ্ছামত ধ্বংস করা যায়'। তিনি মণিপুরকে সঙ্গে তুলনা করেছেন লিবিয়া, সিরিয়া, লেবাননের অবস্থার সঙ্গে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থল-প্রবেশদ্বার হিসাবে 'পূর্বের দরজা' মণিপুর যে সমৃদ্ধির চাবিকাঠি ধারণ করত - সেই গৌরব, প্রাচুর্য আর পরম্পরা ডুবে যাওয়ার ইঙ্গিত দেখি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সঞ্জীব বড়ুয়া মণিপুরকে 'টেকসই বিশৃঙ্খলা'র উল্লেখে। রাষ্ট্র নেতারা মাথায় রাখুন ভারত এক্ট ইস্ট আউটরিচ, মণিপুরকে ভেঙে ফেলার মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।

ভারত-মায়ানমার সীমান্তে উপজাতি, জাতিগত, আন্তঃসীমান্ত জেনেরিক পরিচয়

উত্তর-উপনিবেশিক দুটো জাতিরাষ্ট্র [রাষ্ট্র-জাতি] ভারত আর মায়ানমার [বার্মা] আন্তঃ-সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করা জাতিসত্ত্বাগুলোর সঙ্গে ১৬৪৩ কিলোমিটারের সীমানা ভাগ করলেও, সীমান্তের আশেপাশে অঞ্চলে বাসকরা জাতিসত্ত্বাগুলো দীর্ঘকাল ধরে দুটো দেশের বিরুদ্ধেইয় সক্রিয় সশস্ত্র সংগ্রাম, প্রতিরোধ-বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছে। এই দীর্ঘকালের লড়াই তাকে তথাকথিত 'জাতীয় মূলধারা'য় নিজের সমাজের মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে সাধ্যমত প্রতিরোধ করতে সাহায্য করেছে। মায়ানমারের বিরুদ্ধে [চিন বা পাকিস্তানের মত] ভারত যুদ্ধ করতে যাবে বলেই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিপুল বিশাল সীমান্ত অঞ্চল সামরিক ভাষায় হাইলি মিলিটারাইজড, সেনাবাহিনী প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছে, এমনটা সত্য নয়, বরং এই সীমান্ত অঞ্চলে বাস করা জাতিসত্ত্বাগুলো, সমাজগুলোর পক্ষ থেকে কেন্দ্রিয় ক্ষমতা-কেন্দ্রের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া জাতিসত্ত্বা সংক্রান্ত তীব্র চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দুই উত্তর-উপনিবেশিক রাষ্ট্র তার ব্যারাকে বসিয়ে রাখা বিপুল পরিমান সেনা এবং আধা-সেনাবাহিনীকে সমর পরিকল্পনা মোতাবেক এই সীমান্ত অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে মোতায়েন করতে বাধ্য হয়েছে। ভারত তার সাতাত্তর বছরের স্বাধীনতা যাত্রায় তীব্র অশান্ত উত্তর-পূর্ব ভারত (১) অঞ্চলজুড়ে প্রায় এক ডজন বিদ্রোহ প্রচেষ্টার মুখোমুখি হয়েছে, অন্যদিকে মায়ানমারকে সামলাতে হয়েছে ভারতের তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ পরিমান সশস্ত্র বিদ্রোহ উদ্যম (২)।

ভারত আর মায়ানমার রাষ্ট্র এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দু'ধরণের রণকৌশল গ্রহণ করেছে, ক) মায়ানমারের সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থা গত কয়েক দশকে বিদ্রোহী জাতিসত্ত্বাগুলোর বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। এর ফলে সে বিপুল পরিমান ভূখণ্ডের ওপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে [ব্রাদারহুড এলায়েন্সএর সঙ্গে ১০১৭এর লড়াইতে] (৩) এবং খ) সীমান্তের উল্টোদিকে ভারত রাষ্ট্র কিন্তু তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া জাতিসত্ত্বাগুলোর প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ দমনে মায়ানমার রাষ্ট্রের মত সেনাবাহিনী ব্যবহার করে যুদ্ধ করে নি, বরং সে খুবই চতুর পরিকল্পনায় কৌটিল্য নীতি অনুসরণ করে আলাপ-আলোচনা চালানো, অর্থের লোভ দেখানো, বলপ্রয়োগ করা আর সমাজের মধ্যে বিভাজন তৈরির (শাম, দাম, দণ্ড, ভেদ) চমকপ্রদ কূটনীতি প্রয়োগ করে বিদ্রোহ পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে (৪)। অথচ মায়ানমার সেনাবাহিনী বা তাতমাদাও ১৯৬২ থেকে বিদ্রোহ দমনে বলপ্রয়োগ করেচলেছে কিন্তু আজও সাফল্য অধরা। নির্বাচিত ভারত সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জাতিসত্ত্বানির্ভর বিদ্রোহকে সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করে তার রাজনৈতিক সমাধানের পথে হাঁটার চেষ্টা করছে; ঠিক উল্টোপানে ভারত সীমান্তের ওপরে মায়ানমারের দীর্ঘকালের সামরিক শাসকেরা আজও বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে বিজয়ের স্বপ্ন দেখছে। মাঝের আধা দশক সময়ে ২০১৬-২০২১এর মধ্যে আং সাং সু কি'র নেতৃত্বে অসামরিক শাসনে শাসক ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রাসি জাতীয়স্তরে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে বিদ্রোহী জাতিসত্ত্বাগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর উদ্যোগ নিয়েয়েছিল (৫)।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমি বোঝার চেষ্টা করব ভারত-মায়ানমার আন্তঃ-সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে বাস করা এক দল আদিবাসী জাতিসত্ত্বার মধ্যে মাত্র দুটি জেনেরিক পরিচয়বাচক জাতিসত্ত্বা নাগা আর মিজো সমাজের (মিজো-কুকি-চিন) উদ্ভাস; এবং এই দুই জাতিগত গোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসিত/বিচ্ছিন্নতাবাদী/প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রত্যুত্তরে ভারত রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে এই দুই সমাজ নিজেদের পরিচয় তৈরি করতে পেরেছে। নাগা এবং মিজো সমাজের জাতিসত্ত্বা বিকাশের প্রক্রিয়া এখনও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। মাথায় রাখতে হবে বাঙালিরা ১৯৪৭এর দেশভাগের সময়েও ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভাজিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কিন্তু তারা জাতীয় পরিচয় অর্জন করতে পেরেছিল। আজও নাগা বা জো আদিবাসী গোষ্ঠী সেই জাতিসত্ত্বামূলক চরিত্র অর্জন করে উঠতে পারে নি। বঙ্গভাগের সময় বঙ্গ সমাজে যে ধর্মীয় বিভাজনের কলুষ তৈরি হয়েছিল, সেই শক্তি খুব তাড়াতাড়ি শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ-ভাষিক জাতীয়তাবাদের উত্থানে পরাস্ত হয় এবং এই পরিস্থিতি বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে ১৯৭১এর মহান স্বাধীনতা অর্জনের দিকে পরিচালিত করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক জাতি হিসাবে বাংলাদেশের উত্থান ঘটাতে সাহায্য করে। স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদ ১৯৭৫এ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বাংলাদেশকে কুক্ষিগত করে দু'দশকজুড়ে সামরিক শাসন পর্ব চালালেও, ২০০৯এ আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় ফিরে আসার ফলে বাংলাদেশে সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে 'একাত্তরের চেতনা' (১৯৭১এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা) ফিরে এসেছে বলা যায়।

বাঙালি জাতিসত্ত্বার সঙ্গে নাগা/জো'র জাতিসত্ত্বার পরিচয়ের তুলনা করার কারণ হল বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তর-পূর্ব ভারত আর মায়ানমার থেকে শুরু করে ভারত-চীনা পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দীর্ঘ প্রসারিত জাতিসত্ত্বা গঠনের প্রক্রিয়াগুলোকে গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করা। মাথায় রাখতে হবে ১৯৪৭এর পর থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী উত্তর-ঔপনিবেশিক এশীয় জাতি-রাষ্ট্রগুলির 'মূলধারার এজেন্ডা' চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিপরীতে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার হুমকি দেওয়ার মত কঠিন কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেবিগনিউ ব্রজেজিনস্কি এই বিস্তৃত ভৌগোলিক অংশকে 'এশিয় অস্থিরতার খিলান' বলেছেন(৬)। সদ্য প্রয়াত আমেরিকিয় দিগগজ পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ জেমস এস স্কট, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ার কেন্দ্রীয় উচ্চভূমিকে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জোমিয়া উচ্চভূমি' হিসাবে বর্ণনা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক গবেষণা পরিচালনা করেছেন ['জোমিয়া' - জোমিয়া মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল অংশের নতুন নাম - ভিয়েতনামের মধ্য উচ্চভূমি থেকে পশ্চিম দিকে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম চীনা প্রদেশ ইউনান, গুইঝো এবং পশ্চিম গুয়াংজি হয়ে পশ্চিম দিকে ছড়ানো। জোমিয়ার ইতিহাস শুরু হয়েছে ১৯৯৭তে নৃ-বিজ্ঞানী জিন মিচৌ বিপুল বৈচিত্র্যময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় অঞ্চলে গবেষণার সূত্রে নতুন এক দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার করার পর থেকে। তখনও পর্যন্ত পণ্ডিতেরা এই অঞ্চলকে নিয়ে নির্দিষ্ট গবেষণার প্রক্রিয়া, টুলকিটের খোঁজে ছিলেন। কয়েক হাজার ভাষা, কয়েক ডজন ধর্ম, বিস্তৃত সামাজিক কাঠামো এবং বৈচিত্রময় রীতিনীতির বিস্তৃত পরিসর নিয়ে ভেসে থাকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যে কোনও নৃবিজ্ঞানীর কাছে নতুন দিশা উন্মোচনকারী কাজের স্বপ্নিল অঞ্চল। এই অঞ্চলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে একমাত্র পাপুয়া নিউ গিনির সমৃদ্ধ

প্রাকৃতিক-সামাজিক বৈচিত্র্য - জিম স্কটের বই, দ্য আর্ট অব নট বিং গভর্নডের ভূমিকা থাকল For two thousand years the disparate groups that now reside in Zomia (a mountainous region the size of Europe that consists of portions of seven Asian countries) have fled the projects of the organized state societies that surround them—slavery, conscription, taxes, corv?e labor, epidemics, and warfare. This book, essentially an "anarchist history," is the first-ever examination of the huge literature on state-making whose author evaluates why people would deliberately and reactively remain stateless. Among the strategies employed by the people of Zomia to remain stateless are physical dispersion in rugged terrain; agricultural practices that enhance mobility; pliable ethnic identities; devotion to prophetic, millenarian leaders; and maintenance of a largely oral culture that allows them to reinvent their histories and genealogies as they move between and around states. In accessible language, James Scott, recognized worldwide as an eminent authority in Southeast Asian, peasant, and agrarian studies, tells the story of the peoples of Zomia and their unlikely odyssey in search of self-determination. He redefines our views on Asian politics, history, demographics, and even our fundamental ideas about what constitutes civilization, and challenges us with a radically different approach to history that presents events from the perspective of stateless peoples and redefines state-making as a form of "internal colonialism." This new perspective requires a radical reevaluation of the civilizational narratives of the lowland states. Scott's work on Zomia represents a new way to think of area studies that will be applicable to other runaway, fugitive, and marooned communities, be they Gypsies, Cossacks, tribes fleeing slave raiders, Marsh Arabs, or San-Bushmen] লাওস, থাইল্যান্ড ও মায়ানমারের পাশাপাশি চীনের চার প্রদেশে। স্কটের ভাষায় জোমিয়ার ১০০ মিলিয়ন বাসিন্দা এবং সংখ্যালঘু মানুষের সমাবেশ 'সত্যিই মাথা খারাপ করে দেওয়ার মত জাতিগত এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য' (৭)। বৃহত্তর

ভূ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ পরাশক্তি এবং আঞ্চলিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে থাকা গোষ্ঠীগুলি গোষ্ঠী-থেকে-জাতিসত্ত্বায় বিবর্তিত হওয়ার অবস্থানে প্রবেশের ধারাবাহিকতা এবং জাতিসত্ত্বা বনাম জাতি-রাষ্ট্র দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গিতে লম্বা আকারের আলোচনার প্রয়োজন। মাথায় রাখতে হবে জাতিসত্ত্বা বনাম

জাতীয়তাবাদের সমস্যাগুলোকে (ফল্টলাইন) নিয়ন্ত্রণ করার হাতিয়ারগুলো ইওরোপিয় উপনিবেশিক শক্তি আবিষ্কার করেতে পেরেছিল; তাই তারা বিংশ শতকের উদীয়মান এশিয় জাতীয়তাবাদ কোথাও রুখে দিতে পেরেছে, কোথাও বা দমিয়ে দিতে পেরেছে। আশ্চর্যের কথা হল, নানান ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম অদ্ভুতভাবে বারবার ঘুরেফিরে যুগে যুগে নতুন করে আবির্ভূত হওয়ার অভ্যাসকে নিয়মে পরিণত করেছে।

স্মিথের 'এথাইন'

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ব্রিটিশ শাসন আমলে দিকনির্দেশক ভৌগোলিক অঞ্চল ছিল, সেটি ১৯৪৭এর পর উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অংশ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়। তার বর্তমান ভৌগোলিক রূপরেখা উপমহাদেশ ভাগের সময়ে ব্রিটিশদের পূর্বাঞ্চল সংক্রান্ত পরিকল্পনার অনুসরণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। দেশভাগের আগের সময়ে নাগা আর জোএর মত জাতিসত্ত্বাগুলোকে সীমান্তের দুপাশে রেখেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে বার্মাকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন রাষ্ট্র পত্তন করেছে। পূর্ববর্তী আহোম আঞ্চলিক সাম্রাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন জাতিগত সীমানার মধ্যে জাতিসত্ত্বাগুলিকে রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ভৌত সীমান্ত বিভাজন করার ফলে এই অঞ্চলে নির্দিষ্ট ধরনের সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব আরোপিত হল; পরের সময়ে উত্তর-উপনিবেশিক ভারত এবং মায়ানমার (বার্মা) রাষ্ট্র, এই বিকাশমান জাতিসত্ত্বাগুলির ওপর যে যুক্তরাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কাঠামো আরোপ করল, সেটা নাগা ও জোএর মত দুই সমাজের চরিত্র বিবর্তনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে, ঠিক যেমনভাবে ত্রিপুরায় রাজতন্ত্র-উত্তর সময়ে 'উপজাতি' পরিচয় বিকাশলাভ করেছে এবং স্বাধীনতা লড়াই-উত্তরকালে বাংলাদেশে 'জুম্ম' পরিচয় তৈরি হয়েছে।

এই রূপান্তরের অক্ষহৃদয়টি হল উপজাতি এবং গোষ্ঠী পরিচয় ক্রমশ বিলীন হওয়া, কিংবদন্তি ব্রিটিশ পণ্ডিত অ্যান্থনি ডি স্মিথএর ভাষায় 'জাতিসত্ত্বাগত জাতীয়তাবাদ'এর উত্থান। সমস্ত জাতিই তৈরি হয়েছে নির্দিষ্ট একটি প্রভাবশালী 'জাতিসত্ত্বাগত অক্ষহৃদয় [কোর]' নির্ভর করে - এই ধারণা বিকাশলাভ করেছে জাতীয়তাবাদকে আধুনিক প্রপঞ্চ [ফেনোমেনা] হিসেবে উপস্থাপন করার সময় থেকেই। মাথায় রাখতে হবে প্রত্যেকটা জাতিরই [নেশান] উৎপত্তি ঘটেছে প্রাক-আধুনিক সময়ে। স্মিথের প্রতর্ক হল, জাতীয়তাবাদ দাঁড়িয়ে আছে 'গোষ্ঠী'গুলোর অতীত ইতিহাসের পরিচয়ের ভিত্তিতে এবং এই ইতিহাসকে সাধারণ পরিচয় [কমন আইডেন্টিটি] এবং ভাগ করা ইতিহাসের [শেয়ার্ড হিস্টোরি] ধারায় রূপ দেওয়ার উদ্যমে (৮)। স্মিথ স্পষ্ট ভাষায় বলছেন অতীত সময়ের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা সাধারণত আধুনিক রাজনৈতিক এবং জাতিগত তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক অবস্থানকে বৈধতা দেওয়ার জন্য খাড়া করানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, জাতীয়তাবাদে কোনও এক নির্দিষ্ট 'জাতির' প্রত্যেক সদস্যদকে নির্দিষ্ট ধরণের কাঠামোয় অঙ্গীভূত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, শুধু জাতিসত্ত্বা এবং আর জাতির অন্য সদস্যর প্রতি সংহতির তীব্র বন্ধন অনুভব করলেই যথেষ্ট। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে (locale লোকেল) নির্দিষ্ট প্রভাবশালী তাত্ত্বিক অবস্থানের ওপর

নির্ভর করে জাতীয়তাবাদ বাসা বাঁধতেও পারে এবং উদ্ভাসিতও হতে পারে। জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে পূর্ব-বিদ্যমান আত্মীয়তা, ধর্মীয়তা এবং বিশ্বাস নির্ভর ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। যে জাতিসত্ত্বা, গোষ্ঠীকে আধুনিক নেশন হিসেবে গড়ে তোলে, তাকে স্মিথ আখ্যা দিচ্ছেন এথনাই [ethnie] নামে। স্মিথের 'এথাইন'-এর সংজ্ঞা নির্ভর করে আমরা নাগা, জো এবং আরও অনেক গোষ্ঠী, 'উপজাতি' আর 'জুম্মা'র আদিবাসী পরিচয় থেকে জাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার জেনেরিক পরিচয়ের যাত্রাপথ চিহ্নিত করতে পারব।

'আমার লক্ষতে, এথাইন শুধুই সাধারণ নামের জনসাধারণ, বংশ গরিমাময় মিথ, ইতিহাস-কৃষ্টি অথবা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল নিবদ্ধ জনগণের শ্রেণীবিভাগ নয়, বরং এথাইন হল নির্দিষ্ট পরিচয় এবং সংহতিময় এক সম্প্রদায় যা প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিক জনকল্যাণের অভিব্যক্তি খুঁজে পায়।'

স্মিথের তাত্ত্বিক অবস্থান নানান কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। প্রতিস্পর্ধাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হল, তার তত্ত্ব 'রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে জাতিসত্ত্বার অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেয় না'; তবু আজও তাঁর কাজ জাতিসত্ত্বার বিবর্তন বোঝার জন্য সেরা তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে গণ্য হয়। জেমস সি স্কটের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জোমিয়া উচ্চভূমি আলোচনার টুলকিটটি, আন্তঃসীমান্ত জাতিসত্ত্বার চলন কাঠামো এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতি-রাষ্ট্রগুলি সেই জাতিসত্ত্বাগুলোকে আত্তীকরণ/স্বায়ত্তশাসনে ঘেরার উদ্যমের পর্ব-পর্বান্তরগুলোকে বোঝা, বিশ্লেষণ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হয়ে থেকেছে (৯)।

নাগারা পূর্বাঞ্চলের পাঠান গোষ্ঠী

বিংশ শতকের শুরুতে ভৌগোলিকভাবে সম্প্রসারিত থাকা ব্রিটিশ রাজনৈতিক ক্ষমতাতন্ত্র রুখতে, আহোম, মণিপুরী এবং বর্মি সাম্রাজ্য আগ্রাসনের প্রতিরোধের মৌখিক ঐতিহ্যের কৌমস্মৃতির ডালপালা সাজিয়ে স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার পরিচয় ধারণ করে নাগা সমাজ আবির্ভূত হল। অহোম, মণিপুরী, বর্মিদের থেকে নিজেদের উদ্দেশ্যপূর্ণ আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বলা হল, 'আমরা ভারতবর্ষীয় ছিলাম না, ভারতবর্ষীয় কোনও সাম্রাজ্য আমাদের পরাধীন করতে পারে নি'। এহুনি স্মিথের ভাষায় 'এথাইন' হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রাথমিক শর্ত ছিল সমাজের গোষ্ঠীগুলোর 'সংহত' হতে পারার চরিত্র বিকাশ, সেটা আমরা লক্ষ্য করি ১৯২৯এর ১০ জানুয়ারি সাইমন কমিশনকে কোহিমায় নাগা ক্লাবে জমা দেওয়া মেমোরেন্ডাম সূত্রে (১০)।

'১৮৭৯-৮০ তে ব্রিটিশ সরকার আমাদের দেশ জয় করার আগে, আমরা আসাম উপত্যকার অসমিয়া এবং দক্ষিণ অঞ্চলগুলোয় মণিপুরীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়েছি,' সাইমন কমিশনকে জমা দেওয়া নথিতে নাগা প্রতিনিধিদল বললেন, 'তারা যেমন আমাদের হারাতে পারে নি, তেমনি আমরাও তাদের প্রজা ছিলাম না।' সেই নথি সূত্রে আন্দাজ করা যেতে পারে নাগা জাতিসত্ত্বার অসামান্য বৈচিত্র, 'সরাসরি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত নাগা অঞ্চলে (নাগা জাতিসত্ত্বা অর্জন আন্দোলন কর্মী-পণ্ডিত কাকা ইরালু সূত্রে জানতে পারছি আসাম থেকে বার্মা অঞ্চলজুড়ে প্রাচীন নাগা বাসভূমির আয়তন ১,২০,০০০ বর্গ কিলোমিটার) আটটার বেশি আদিবাসী গোষ্ঠী এই ভূখণ্ডে বাস করে। প্রত্যেক নাগা গোষ্ঠী,

প্রত্যেক নাগা গোষ্ঠীর থেকে চরিত্রগতভাবে এতটাই আলাদা যে আমরা কেউ কারোর ভাষা বুঝি না, এবং ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের বাইরে আরও কত আদিবাসী গোষ্ঠী বাস করে, সে জ্ঞান আমাদের নেই। নিজেদের মধ্যে একতা নেই, একমাত্র ব্রিটিশ সরকার আমাদের একজোট করেছে।' নাগা পরিচয়ে চিহ্নিত হওয়ার প্রথম নথিভুক্ত বক্তব্যে জাতিসত্ত্বার বিকাশের অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির দিকে অগ্রসর হতে চাওয়ার আকুতি লক্ষ্য না করে পারি না। এই নথি সূত্রে একটি নির্দিষ্ট ভাষার অভাব, দাবি করা জাতিসত্ত্বাগত অঞ্চলের উপর সাধারণ প্রশাসনের অভাব, উপজাতীয় কৃষ্টির পার্থক্য ইত্যাদিও লক্ষ্য করার বিষয়। মানতে হবে নাগা ক্লাবের প্রতিনিধি দলের স্বতন্ত্র নাগা জাতিসত্ত্বা বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে 'অন্যতার (আদারনেস)' উপর জোর দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। 'সমতলের মানুষদের থেকে আমাদের ভাষা আলাদা; হিন্দু বা মুসলমান সমাজের সঙ্গে আমাদের সামাজিক মেলামেশা নেই। আমরা গরু খাই বলে এক দল আমাদের ঘেন্না করে আর শুয়োর খাই বলে অন্য দল আমাদের অপছন্দ করে এবং উভয়ই আমাদের শিক্ষার অভাবের জন্যে দায়ি।'

ইন্টারেস্টিং বিষয় হল, প্রত্যেকটি আদিবাসী গোষ্ঠী আর প্রতিটি গ্রামের প্রাচীনতর সময় থেকে চলে আসা স্বাধীন চরিত্র বজায় রাখার জন্যে নাগা জাতিসত্ত্বার বিকাশের কোনও স্তরেই নাগা প্রবীণদের পক্ষ থেকে জাতিগত ঐক্যের ডাক দেওয়া হল না। নাগা রাজনৈতিক এবং ঐতিহ্য অনুসারে প্রতি গ্রাম, প্রতি আদিবাসী গোষ্ঠী স্বশাসনের অধিকার নিয়েই এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য। এক আদিবাসী গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে, এক গ্রাম অন্য গ্রামকে শাসন করতে পারে না, এবং এগুলো তারা ঐতিহাসিকভাবে কোনও দিনও করেও নি। ফলে আহমিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যদি কখনও আও বা কন্যাক নাগা আদিবাসী গোষ্ঠী হেরে গিয়েও থাকে, সামগ্রিকভাবে নাগা সমাজের ওপর সেই হার বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি' (১১)। নাগাদের এই ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক অবস্থানের জন্যে অন্য জাতিগোষ্ঠী, যারা জাতিসত্ত্বা অর্জনের জন্যে একজাতি (নেশন) হওয়ার ডাক দিয়েছিল, তাদের থেকে আলাদা হয়ে উঠল। অনেকেরই ধারণা নাগা জাতিসত্ত্বা গঠন প্রক্রিয়ার প্রধান দুর্বলতা উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্যের এই দৃঢ় বোধ। মাথায় রাখতে হবে নাগা আদিবাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে পাঁচটি আলাদা আলাদা বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বাস করে সেগুলি হল নাগাল্যান্ড রাজ্য, মণিপুর রাজ্য, আসাম রাজ্য, অরুণাচল প্রদেশ এবং মায়ানমারের নাগা আদিবাসীদের স্ব-শাসিত এলাকা (যাকে নাগা বিদ্রোহী গোষ্ঠীরা পূর্ব নাগাল্যান্ড আখ্যা দেয়)।

উনবিংশ-বিংশ শতকে অধিকাংশ নাগা আদিবাসী গোষ্ঠী খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে ভারত থেকে মানসিকভাবে আলাদা হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে, যেহেতু ভারতে অধিকাংশ মানুষ হিন্দু বা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত; একই সঙ্গে তারা বৌদ্ধ মায়ানমারের সঙ্গেও একাত্ম বোধ করল না। নাগারা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে আলাদা চরিত্র বজায় রাখতে চাওয়ার বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বর্তমান সময়ের নাগা জনগোষ্ঠীর সব থেকে বড় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল ফর নাগাল্যান্ড বা এনএসসিএনএর 'নাগাভূমি খ্রিষ্টভূমি' শব্দবন্ধওয়ালা ডাক থেকে। বর্তমান প্রতিবেদক সংবাদ সংগ্রহের জন্যে একদা গিয়েছিলেন মায়ানমারের সাগাইং প্রদেশের চুইয়াং নকনুতে এনএসসিএন জেনারেল সদর দফতরে। তিনি সেই শিবিরের বাইরে দাঁড় করানো বিশাল একটা ক্রুশ লক্ষ্য না করে পারেন নি। একই সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছেন

রবিবারের প্রার্থনা সভায় 'চ্যাপলেন কিলোনসার' (চার্চ পরিষেবা মন্ত্রী) ভেদাই চাকেসাং-এর উপস্থিতি। গায়ক গায়িকারা মন্ত্রী মহোদয়ের অধীনে যেমন গানও করছেন, তেমনি অন্যান্য ধর্মীয় সেবাও দিতে ব্যস্ত থেকেছেন (১২)। মাথায় রাখতে হবে নাগা বিদ্রোহীরা খ্রিষ্ট অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও চিনা সেনার প্রশিক্ষণ নিতে তাদের সমস্যা হয় নি। চিনা ভূখণ্ডে বসবাস করা এনএসসিএনএর চেয়ারম্যান আইজাক চিসি সু (নাগাল্যান্ডের সীমা নাগা), ভাইস-চেয়ারম্যান এস এস খাপলং (বর্মী হেমি নাগা) এবং জেনারেল সেক্রেটারি থুইংলাং মুইভা (মণিপুরের থাংখুল নাগা) হওয়া সত্ত্বেও চিন তাদের প্রশিক্ষণ দিতে কার্পণ্য করে নি বা তাদেরও সেই প্রশিক্ষণ পেতে খুব বেশি সমস্যা হয় নি। ১৯৬৬তে চিনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তুঙ্গ মুহূর্তে, সাম্প্রতিককালে প্রয়াত থুইংলাং মুইভা প্রথম নাগা দল হিসেবে ১৯৬৭তে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে চিনে যান। স্বঘোষিত মেজর জেনারেল ভি এস এটেম এই প্রতিবেদককে দুঃখ করে বলছেন ১৯৬০এর দশকে নিরীশ্বরবাদীদের চিন দেশে সেনাপ্রশিক্ষণ নেওয়া আর অস্ত্র জোগাড়ের কাজে গিয়ে নিয়মিত প্রার্থনা করার জন্যে একটাও চার্চ খুঁজে পান নি তিনি (১৩)।

উপনিবেশ-উত্তর ১৯৫০এর দশকের পরের সময়ে ভারত আর বার্মার বিরুদ্ধে আন্দোলনে রাস্তায় নামা নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী/প্রতিরোধ দলের মনে হয়েছে নাগাদের আদিবাসীত্বই নাগা জাতিসত্ত্বা বিকাশ আন্দোলনের বর্শামুখ নিষ্ক্রিয় করছে। ১৯৮০তে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল ভারত সরকারের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে, এনএসসিএন গঠন করা আইজাক চিসি সু, খাপলং, মুইভা এবং অন্য চিনা সমর্থিত নাগা গোষ্ঠী মনে করে নাগা গোষ্ঠীগুলোর স্বাধীন আদিবাসীত্বই তাদের প্রধান দুর্বলতা, তারা মনে করে কাউন্সিলের সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ভারত সরকারের কাছে 'বিক্রি' হওয়ার সামিল।

'স্বীকার করতে হবে, প্রভূত দেশপ্রেম এবং বীরত্বের কৃতিত্ব সত্ত্বেও, নাগারা নিজেদেরকে বারবার পরাজিত হতে দেখছে। এর একমাত্র কারন জাতীয়তা বিষয়ে সামাজিক থাকবন্দীর উচ্চতম স্থানে সংকীর্ণতার চর্চা। তাছাড়াও জনগণকে যে পথে চলতে হবে সেই পথ এখনও আলোকিত নয় (১৪)।'

নাগা জাতিসত্ত্বা বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ব্রিটিশ প্রশাসকদের আলাদা নাগা জাতিসত্ত্বা বিকাশে নির্দিষ্ট প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উদ্যম। সাইমন কমিশনে নাগা ক্লাবের ডেপুটেশন দেওয়াকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ১৯২৮এ নাগা হিল অঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার জে এইচ হাটন, তাঁর প্রতিবেদনে সাম্রাজ্যের কর্তাদের জানালেন, 'তাদের সংস্কার প্রক্রিয়ায় অংশিদার করতে গেলে পাহাড়ি অঞ্চলের স্বার্থ রক্ষা হবে না কারন এর ফলে তারা সমতল অঞ্চলের রাজনৈতিকভাবে আরও উন্নত জেলাগুলোর সঙ্গে জুড়ে যাবে - কৃষ্টিগতভাবে পাহাড়িরা কোনও দিনই হিন্দু বা ইসলামের অংশ ছিল না' (১৫)।

১৯৩৫এ গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এক্ট নাগা পাহাড়কে আসামের সঙ্গে জুড়লেও, উপনিবেশিক প্রশাসন তুয়েংসাং অঞ্চলকে ব্রিটিশ 'প্রশাসনিক অঞ্চল' হিসেবে ঘোষণা করে। হাটনের প্রশাসনিক উত্তরাধিকারী স্যর চার্লস পাউসি, কোহিমা যুদ্ধে জাপানিদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীকে সাহায্য করার প্রতিক্রিয়ায়, 'নাগা গোষ্ঠীদের সামাজ-কৃষ্টির উচ্চাশা পূরণে ১৯৪৫এর ১ এপ্রিল নাগা হিলস ডিস্ট্রিক্ট ট্রাইবাল কাউন্সিল তৈরি করেন। ১৯৪৬এ এটির নতুন নাম হয় নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল। নাগা জাতিসত্ত্বা বিকাশে এবং জাতিগঠন প্রক্রিয়ায়

ব্রিটিশ সরকারকে চার দফা দাবিপত্র জমা দিয়ে বলা হল, 'নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল নাগা জাতিসত্ত্বা বিকাশে নাগাদের একজোট করার প্রক্রিয়ায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এমনকী যারা তার প্রশাসনিক অঞ্চলের বাইরে বাস করে তাদের জন্যও তার এই উদ্যম বজায় থাকবে; কাউন্সিল বাংলা-আসামের সংযুক্তির বিরোধিতা করে, কারন এর একটা ভৌগোলিক অংশ নাগা হিলস; কাউন্সিলের দাবি স্বাধীন ভারতে আসাম রাজ্যে নাগা হিলস অঞ্চলকে স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হোক, এবং সেই অঞ্চলের নাগা আদিবাসীদের আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবেও স্বীকৃতি দেওয়া হোক' (১৬)।

কীভাবে সদ্য-স্বাধীন ভারত সরকার নাগা গোষ্ঠীগুলোর ইস্যুগুলোতে নাকানিচোবানি খেয়ে, ভুল পদক্ষেপে নাগাদের স্বশাসনের দাবিকে বিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিল, কীভাবে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের এ জেড ফিজোর স্বাধীনতার জন্যে গণভোটের দাবি থেকে নিজেদের আলাদা করা সমঝোতাপন্থী Sashinmieren Aier, T.Sakhrie, নেহেরুর দলের সঙ্গে আলোচনা চলাকালীন কাপড়েচোপড়ে হলেন, ফিজোর অঙ্গুলি হেলনে কীভাবে ১৯৫১য় গণভোট অনুষ্ঠিত হল এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরু নাগা স্বশাসনের দাবি বাতিল করে গোয়েন্দা বাহিনী প্রধান বি এন মল্লিকের প্ররোচনায় সেনা নামিয়ে বিদ্রোহ দমনের যে সব হঠকারী প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেন সে সব তথ্য আজ সহজলভ্য (১৭)। সেই রাজনৈতিক আলোচনা বর্তমানের আলোচ্য প্রবন্ধের আওতার বাইরে, আমরা এই প্রবন্ধে নাগা জাতিসত্ত্বার বিকাশ এবং ভারত আর মায়ানমারের নাগা বসতি অঞ্চলগুলোয় আলাদা নাগা রাষ্ট্র তৈরি উদ্যম আলোচনায় মনোনিবেশ করতে অধিকতর আগ্রহী।

নাগা জাতিসত্ত্বা বিকাশ আর পরিচয় তৈরির ব্যর্থতা এবং বিপত্তির স্পষ্ট প্রতিফলন দেখি ১৯৫৬র পরের সময় থেকে চলতে থাকা নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সূত্রে। কাকা ইরালু কথিত ১২০০০০ বর্গ কিলোমিটারের 'অবিচ্ছিন্ন নাগা অঞ্চল'এর স্বপ্ন যে বর্মি নাগা আর ভারতীয় নাগাদের মধ্যে হিংসার সম্পর্ককে দূর করতে পারে নি, তার হাতে কলমে প্রমান পাওয়া গেল ১৯৮৮তে মুইভা-সু আর খাপলং গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংস যুদ্ধে বেশ কয়েকটা জীবন চলে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। এক দিকে মুইভা গোষ্ঠী আঙ্গামীদের (ফিজো গোষ্ঠী, যে গোষ্ঠী থেকে অধিকাংশ নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল নেতা এসেছেন) মুণ্ডুপাত করছে প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বাসঘাতক হিসেবে, এবং ১৯৮৩তে তাঁর লেখা 'পোলারাইজেশন' বইতে নিজের গোষ্ঠী তাংখুলদের অভিহিত করছেন বিপ্লবী দল হিসেবে (কিছু বিদ্রোহী নাগা নেতা যেমন নিহত নেতা জেকোপে ক্রোমে ঐ লেখাটিকে মুইভার ট্রাইবালিজমের স্পিরিটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আখ্যা দিচ্ছেন); নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল স্বঘোষিত ব্রিগেডিয়ার Thinoselie Medom Keyhoকে চিনে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে পাঠালে নাগা সেনাবাহিনীর স্বঘোষিত প্রধান সেনাপতি কাইটো শুখাইএর নেতৃত্বে সিমারা, নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল ছেড়ে রেভলিউশনারি গভর্মেন্ট অব নাগাল্যান্ড তৈরি করেন। এই নতুন দলের প্রক্ষোভ ব্যবহার করে, ভারত সরকার চিন দেশ থেকে মোউ আঙ্গামীর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে আসা প্রধান নেতা সহ বিদ্রোহী দলকে গ্রেফতার করে এবং আমদানি করা অস্ত্র উদ্ধার করে। এর পরে কাটিও সুখাইকে ১৯৬৮তে এক নাগা বিদ্রোহী হত্যা করে (১৮)। কাটিওর অনুগামীরা আত্মসমর্পণ করলে তাদের অধিকাংশকে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীতে

চাকরি দেওয়া হল। এটাই ছিল বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সব থেকে বড় বিভাজন (১৯৬০এ ১৬ দফা চুক্তিতে আলাদা নাগা রাজ্যের দাবি স্বীকৃতির পর মধ্যপন্থীরা বিদ্রোহ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল)। এই লেখক এর আগেও বলেছে, এই চুক্তির ফলে ইন্দিরা গান্ধী চিনের উস্কানিতে নাগা বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের ব্যাপক বিষাক্ত হিংসক কাজকর্ম রুখতে এক সময় নাগাদের ভূটানের মত আশ্রিত রাষ্ট্রে স্বীকৃতি দেওয়ার ভাবনা থেকে সরে আসেন (১৯)।

১৯৬০এর দশকের শেষের দিকে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল- রেভলিউশনারি গভর্মেন্ট অব নাগাল্যান্ড বিভাজনের পরে নাগা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আরও ৫টা বড় বিভাজন হয়েছে - ১) ১৯৭৫এর শিলং চুক্তির উত্তর সময়ে তাংখুলেদের অধিকাংশ সদস্য বেরিয়ে গিয়ে এনএসসিএন গঠন করে এবং কোনিয়াকেরা বর্মি নাগাদের সমর্থন দেয় - কারন এই বিতর্কে বর্মি নাগাদের মনে হচ্ছিল, তারা নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য, বিপুল নাগা যোদ্ধাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার জন্যে শিবিরে আশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে ক্ষমতা অর্জনে বঞ্চিত থেকেছে; ২) নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের মধ্যেও বিভাজন তৈরি হল, ফিজোর কন্যা বড় বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে যান; ৩) খাপলংএর বর্মি নাগা গোষ্ঠী আর কনিয়াকেরা মিলে তাংখুলের বহু সেনা আর 'কর্ণেল' লুতিয়া তাংখুলকে হত্যা করে; ৪) খাপলং গোষ্ঠী থেকে Khole Konyak আর Khitovi Zhimomi বেরিয়ে কোনিয়াক আর অন্য ছোট ছোট গোষ্ঠী অধ্যুষিত Mon-Tuensang অঞ্চলকে স্বশাসিত নাগা অঞ্চলরূপে ঘোষণার দাবি জানান; ৫) খাপলং গোষ্ঠীতে আবারও ভাগ হল সৎ ছেলে Yung Aungকে বহিষ্কার করা হলে তিনি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান Khango Konyakকে নিয়ে দল ছেড়ে যান।

১৯৯৭তে ভারত সরকার এনএসসিএন (মুইভা-সু) গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা চালালেও সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির খুব বেশি অগ্রগতি হয় নি। ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা নাগা আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য অধিকাংশ সময়ে উপজাতীয় এবং উপদলীয় (প্রায়শই কোটারমিনাস) বিভাজন নিয়ে খেলেছে নাগা সমাজের মধ্যে বিদ্যমান ফাটলগুলোকে ব্যবহার করে। ২০১৫য় এনএসসিএন (মুইভা-সু)-র সঙ্গে ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষর করার পথ প্রশস্ত হলেও বহু দফা আলোচনা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয় নি। নাগা গোষ্ঠীদের আলোচনায় মধ্যস্থ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত গোয়েন্দা বাহিনীর প্রাক্তন স্পেশাল ডিরেক্টর, আর এন রবি' এনএসসিএনএর পূর্ব নাগাল্যান্ডের দাবিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার দাবিতে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এনএসসিএন যদি চুক্তি স্বাক্ষর না করে, তাহলে ভারত সরকার অন্য গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হবে। এই সরকারি বিবৃতি সূত্রে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, ভারত রাষ্ট্র জমিতে নাগা গোষ্ঠীগুলোকে হারাতে না পারলেও আলোচনার টেবলে ডেকে এনে হারাতে পেরেয়েছে, অন্যভাবে বললে অন্তত কোনঠাসা করতে পেরেছে সেনাবাহিনী নির্ভরতা কাটিয়ে মাঠ-নিরপেক্ষ যুদ্ধপ্রকরণ, গোয়েন্দাবাহিনীকে সক্রিয় করে কৌটল্যের কূটনীতি প্রয়োগ করার মাধ্যমে (২০)। একটা বিষয় পরিষ্কার ভারত রাষ্ট্র অসমমিতিক (asymmetric) সমর কৌশলে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে নাগাদের মতো একদা শক্তিশালী জাতিগত বিদ্রোহীদের বৃহত্তর জাতিগত পরিচয়ের উপজাতীয় বিভাজন তোল্লাই দিয়ে, অনেকটাই নির্জীব, নির্বিষ

করতে পেরেছে।

-০-

আমরা বলতেই পারি, আফগান জাতিসত্ত্বার মতই নাগা গোষ্ঠীগুলোর আদিবাসী পরিচয় বিকশিত হয়েছে বিদেশিদের প্রতি জন্মগত অবিশ্বাসের ফলে, বিদেশি সেনা শক্তির জমি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী যুদ্ধের ডাকে - কিন্তু একই সঙ্গে বলতে হবে, গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চলতে থাকা অন্তর্দ্বন্দ্ব রাষ্ট্র শক্তিকে সুযোগ করে দিয়েছে আন্দোলন দমনের পরিকল্পনা সার্থক রূপায়ন করতে। সোভিয়েত রাশিয়ার মত পরাশক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগান গোষ্ঠীগুলো একজোট হয়ে লড়েছিল আরেক বিদেশি পরাশক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থনে, এমন কী পরে আমেরিকিয় দখলদারির বিরুদ্ধেও তারা সক্রিয় থেকেছে এবং সফলও হয়েছে; এত সব সত্ত্বেও আফগান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কিন্তু জাতিবৈরিতা বিন্দুমাত্র কমে নি - পাশতুন (আফগান আর পাকিস্তান ভূমিবাসী), তাজিক আর উজবেগী (তাজিকিস্তান আর উজবেকিস্তান তাদের ভূমিখণ্ড হলেও বিপুল সংখ্যায় উজবেগীর বাস আফগানিস্তানে) এবং হাজারাদের মত আরও বহু সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্ব দিনের আলোর মত বাস্তব। ভারত আর বার্মার বিরুদ্ধে সীমান্ত জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলন চালানো এনএসসিএনএর 'বৃহত্তর নাগাল্যান্ড' তৈরির ডাকে নাগা গোষ্ঠীগুলো এক ছাদের তলায় এলেও আন্তঃ-গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বন্ধ করে অধরা নাগা জাতিসত্ত্বা সম্পূর্ণ করার দিকে যাত্রার পথ তৈরির উদ্যমের নিশানা দেখা যাচ্ছে না। খাপলাং গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে বার্মা ভূমি হারিয়ে এবং ১৯৯৭ থেকে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা টেবলে বসার পরে এনএসসিএনএর 'বৃহৎ নাগাল্যান্ড' স্বপ্ন থেকে 'পূর্ব নাগাভূমি' প্রকল্প বাদ দেওয়ার পথে হেঁটে তারা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের নাগা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খাপলং গোষ্ঠীর অধিকাংশ নেতা বর্মি নাগরিক যুক্তি দেখিয়ে ভারত সরকার তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে গররাজি হলে খাপলং গোষ্ঠী ভারতীয় সেনা এমন কী এনএসসিএন (আইজাক-মুইভা) গোষ্ঠীর ওপর সশস্ত্র আক্রমন চালায়। কিন্তু এই গভীর দ্বন্দ্বের ফাটল নাগা জাতিগত পরিচয়কে প্রভাবিত করলেও, ভারত ও মায়ানমার উভয় অঞ্চলে অবাধে যাতায়াত করা নাগা, জো উপজাতিদের মতো, ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বেড়া দেওয়ার এবং অবাধ চলাচল ব্যবস্থাকে বাতিল করার সাম্প্রতিক ভারত সরকারের সিদ্ধান্তর সক্রিয় বিরোধিতা করেছে; মাথায় রাখতে হবে নাগা এবং মিজো-কুকি-চিন (বিস্তৃতভাবে জো) উভয় স্থানীয় উপজাতিগুলোকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের উভয় পাশে ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত পাসপোর্ট এবং ভিসা ছাড়াই যাতায়াত করার অধিকারী। ব্রিটিশ সময় থেকে চলে আসা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের বাধা নিষেধ এড়িয়ে সীমান্তের দুপাশে নাগা গোষ্ঠীগুলোর অবাধে যাতায়াত করার অধিকারে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন দিতে দুই নাগা বসবাসকারী রাষ্ট্র ভারত-মায়ানমার ২০১৮য় দ্বিপাক্ষিক 'ভূমি সীমান্ত পারাপার নিষেধ' চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল। অথচ এর ৬ বছর পর, চলতি ২০২৪ সালে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উগ্রপন্থী আর চোরাচালনাকারীদের 'অবাধে সীমান্ত ব্যবহার বন্ধ করতে এবং সীমান্তে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে' কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা রূপায়ণ করার কথা জানিয়েছেন (২১)।

মিজরামের নতুন মুখ্যমন্ত্রী লালডুহোমা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া

দেওয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, নাগাল্যান্ডের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই প্যাটন জানিয়েছেন সীমান্তে বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা নাগা সমাজ মেনে নেবে না। নাগাল্যান্ডের ভারতীয় জনতা পার্টির জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্যাটন স্পষ্টভাবে নিজের দলেরই কেন্দ্রিয় মন্ত্রীর পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ হয়ে জানিয়েছেন 'মায়ানমারে বিপুল সংখ্যক নাগা জনসংখ্যা বাস করে।' ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার বিরুদ্ধেও ভারতে বসবাস করা বাঙালিরা একই ধরণের যুক্তি দেখেয়েছিল (২২)।

নাগাদের পূর্বাঞ্চলের আফগান আখ্যা দেওয়া অতি-সরলীকরণ হলেও এই তুলনা একেবারেই প্রসঙ্গ বিচ্যুত তত্ত্ব, এ কথা বলা যাবে না। ধর্মীয় বিভেদের পরিবেশে ১৯৪৭এর দেশভাগ সত্ত্বেও ১৯৭১এর মুক্তিযুদ্ধ ঘটেছিল কিন্তু বাঙালি জাতিসত্ত্বার ভাষা-কৃষ্টির চলক নির্ভর করে। এই প্রেক্ষিতে নাগাদের সমস্যা আরও পরিষ্কার। বাঙালিদের মধ্যে ধর্মের বিভেদ থাকলেও নাগাদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ নেই কিন্তু একই ভাষায় নাগা গোষ্ঠীগুলোর কথা না বলা (নাগা ভাষার সঙ্গে কথ্য অসমিয়া জুড়ে একটা সংযোগকারী ভাষা তৈরি হয়েছে) নাগা জাতীয়তাবাদ বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। বাঙালি আর নাগা উভয় জাতিসত্ত্বাই সীমান্তের কাঁটাতারে ভাগ হলেও নাগারা কাঁধে কাঁধ দিয়ে ভারতীয় জাতীয় স্রোতে না মেলার উদ্দেশ্যে লড়াই চালালেও একই ভাষায় কথা বলতে না পারায় জাতিগত একতা তৈরির জন্যে কৌম স্মৃতিকণ্ডুয়নের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। নাগারা ঠিক যেভাবে ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে নিজেদের জাতিগত স্বাতন্ত্রকে সুসংহত করতে পেরেছেন, ঠিক তেমনি আফগান পরিচয়ে আফগানিস্তান আর পাকিস্তানে ছড়িয়ে থাকা পাশতুন, তাজিকিস্তান আর আফগানিস্তানে বিস্তৃত তাজিক এবং উজবেকিস্তান আর আফগানিস্তানে বাস করা উজবেগরা একাট্টা হয়ে সোভিয়েত-আমেরিকিয় আগ্রাসন-দখলদারির বিরুদ্ধে লড়াই দিয়েছেন। সমস্যা হল যে মুহূর্তে বিদেশি শাসক আফগানিস্তানের ভূমি ছেড়ে চলে গেছে, সেই মুহূর্ত থেকেই আন্তঃজাতিসত্ত্বাগত সংঘাত তীব্র হতে শুরু করে এবং এই ধাক্কা পরবর্তী সরকারের স্থিতিশীলতার উপর প্রভাব ফেলছে।

জো সমাজ - একাধিক প্রশাসনিক ইউনিট জুড়ে জেনেরিক আইডেন্টিটি

মিজোরামে, "মিজো" পরিচয় প্রশাসনিক স্বীকৃতিতে ক্ষমতাশালী হয়েছে। ব্রিটিশ প্রশাসন 'লুসাই হিল' শব্দবন্ধ ব্যবহার করলেও স্বাধীন ভারত প্রাক্তন উপনিবেশিক আসাম রাজ্যে মিজো হিল শব্দবন্ধ ব্যবহার করে। মিজো বা পাহাড়ি মানুষদের অধিকাংশই লুসাই আদিবাসী, কিন্তু মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের বিরুদ্ধে কুড়ি বছর ধরে লড়াই করে (১৯৬৬-১৯৮৬) অন্য আদিবাসী যেমন হমরাস, পাওয়াই এবং লাখের মিজো জাতিসত্ত্বার বাইরে থেকেছে। মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট ভারত সরকারের বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করলেও অন্য গোষ্ঠী কিন্তু ভারত সরকারের সঙ্গে নানান পর্যায়ে গোপন যোগাযোগ রেখেছে। ১৯৮৬র চুক্তিতে মিজোরাম স্বাধীন রাজ্য হিসেবে গড়ে ওঠার পরে শঙ্কিত হমরাস, পাওয়াই এবং লাখের গোষ্ঠী জেলা স্বশাসিত বোর্ডের দাবি তোলে। তাদের বৃহত্তর মিজো জাতিসত্ত্বার মধ্যে গণ্য করা হলেও এই আদিবাসীরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, এমন ভৌগোলিক ক্ষেত্র দাবি জানায় তারা। একদিকে মিজোরাম রাজ্য তৈরি করে বৃহত্তর মিজো জাতিসত্ত্বাকে যেমন স্বীকৃতি দেওয়া হল, তেমনি প্রত্যেকটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নামে আলাদা আলাদা জেলা পরিষদ তৈরি করে

তাদেরও জাতিগত সংহতি তৈরির সুযোগ করে দেওয়া হল। মাথায় রাখতে হবে পাউই আর লাখের জেলা পরিষদ এবং চাকমাদের স্বশাসিত আলাদা আলাদা জেলা পরিষদ স্বীকৃতি দেওয়ার উদাহরণ দেখিয়ে হামার আর ব্রুস গোষ্ঠী (ত্রিপুরার রিয়াংরা তাদের জাতিগত আত্মীয়)। এক সময় পাউই, লাখের এবং চাকমারা 'মিজো অত্যাচার' থেকে মুক্তি পেতে দক্ষিণ, পশ্চিম মিজোরামে পূর্ব নাগাল্যান্ডের ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশনের মত সঙ্গঠনের দাবি জানিয়েছিল (২৩)। ত্রিপুরা ট্রাইবাল অটোনোমাস কাউন্সিলের মত মিজোরামের প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের জন্যে কিন্তু সরাসরি কেন্দ্রিয় বাজেট বরাদ্দ করা হল।

মিজোরামের মিজো, মণিপুরের কুকি এবং হামার এবং মায়ানমারের চিন জুড়ে থাকা বৃহত্তর জো পরিচয় ত্রিপুরার 'উপাজাতি' পরিচয়ের মতো টিকে থেকেছে। 'উপজাতি'র আক্ষরিক অর্থ হল ত্রিপুরার আদিবাসী বা উপ-আদিবাসী গোষ্ঠী। এই উপজাতি গোষ্ঠী বর্তমানে ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সেটলারদের থেকে আলাদা চরিত্রের ২০টির কাছাকাছি উপজাতি, যার অক্ষহৃদয় ককবরক-ভাষী ত্রিপুরী-দেববর্মারাও। ত্রিপুরায় উপজাতি বলতে সব কটা আদিবাসী গোষ্ঠী বোঝায় ত্রিপুরী, হালাম, রিয়াং, জামাতিয়া, নোয়াটিয়া, মগ, চাকমা। ফলে ত্রিপুরার স্বশাসিত কাউন্সিলের সঙ্গে জাতিসত্ত্বা নির্ভর শব্দ ত্রিপুরি ব্যবহার না করে ট্রাইবাল শব্দ জোড়া হয়েছে।

ত্রিপুরায় উপজাতি চরিত্রের মত প্রতিবেশী বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পাহাড় অঞ্চলে 'জুম্ম' চরিত্র হল বহু-আদিবাসী গোষ্ঠীর আদিবাসী ভূমি এবং এরা বাঙালিদের থেকে আলাদা চরিত্রের। ত্রিপুরী আদিবাসী সমাজ যেমন ত্রিপুরী উপজাতিদের অক্ষহৃদয় (ত্রিপুরী সমাজের দেববর্মাদের থেকে কিন্তু ত্রিপুরার রাজা মনোনীত হয়) তেমনি চাকমারা হলেন জুম্মাদের অক্ষহৃদয় - উভয়েরই স্বশাসন থেকে স্বাধীনতার দাবি আদায়ের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীগুলোকে সংহত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় উপজাতি চরিত্র অবলম্বনে ত্রিপুরায় প্রথম আদিবাসী রাজনৈতিক সংগঠনের সূচনা হয়। ১৯৬৭তে তৈরি হয় ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমতি আদিবাসী সমিতি। তারা আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার লড়াইতে বরাবরই সক্রিয় থেকেছে। একইভাবে বাংলাদেশে 'জুম্মা' চরিত্র অবলম্বন করে পার্বতীয় চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রায় দুদশক জুড়ে (১৯৭৫-১৯৯৬) সেনা আধা-সেনা শাসিত বাংলাদেশে সহিংস লড়াই চালিয়েছে।

জো জাতিসত্ত্বা ভারতের মিজোরাম রাজ্যে, মায়ানমারের চিন প্রদেশে (যেখানে চিন সশস্ত্র গোষ্ঠী স্বাধীনতা আর স্বশাসনের জন্যে লড়াই চালাচ্ছে), কিছুটা চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চলে (যেখানে নাথাম বাউম তাঁর কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট নির্ভর করে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছেন) আর মণিপুরের কুকি সমাজের বসবাসকারী অঞ্চলগুলোয় ছড়িয়ে আছে। মিজো আন্দোলনের উত্তুঙ্গ সময়ে (১৯৬৬-১৯৬৮) মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট প্রত্যেকটি জো অঞ্চল নিয়ে 'বৃহত্তর মিজোরাম' তৈরির ডাক দিয়েছিল অংশত লড়াই চালানোর জন্যে অস্ত্র চালানোর আর রসদ সরবরাহ করার জন্যে ক্যাডার সংখ্যা বাড়াতে। এনএসসিএন (আইজাক মুইভা) যেমন ১৯৯৭তে ভারত সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চলাকালীন 'গ্রেটার নাগালিম'এর দাবি থেকে 'পূর্ব নাগাল্যান্ড'এর দাবি তুলে নিয়েছিলেন, তেমনি মিজো

ন্যাশনাল ফ্রন্টও ১৯৮৬র আলচনার সময় 'বৃহত্তর মিজোরাম' অঞ্চলের দাবি প্রত্যাহার করে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ছোট সঙ্গঠনগুলো যেমন জোরো বা জোরাম রিউনিফিকেশন অরগানাইজেশন কিন্তু 'বৃহত্তর জোরো' রাজ্যের স্বপ্ন ছেড়ে দেয় নি, যে স্বপ্নের ভিত্তিতে তারা ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমারের সীমান্তে বসতি করা মিজোদের একজোট করতে চেয়েছে; ঠিক যেমন একদা বাংলায় জার্মান আর ভিয়েতনামের উদাহরণ টেনে 'গ্রেটার বেঙ্গল'এর ডাক দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু রাজনৈতিক দাবি হিসেবে বৃহত্তর জো জেনেরিক পরিচয়কে ব্যবহার না করা সত্ত্বেও, বিভিন্ন সময়ে জাতিসত্ত্বাগত সংহতির চেহারা কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বারবার উঠে এসেছে - সেটা ভারত-মায়ানমার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার বিরোধিতাতেও হতে পারে অথবা মিজোরামে চিন শরণার্থী গ্রহণ করার দাবিতেও হতে পারে অথবা মণিপুর থেকে কুকি শরণার্থীদের গ্রহণ করার দাবিতেও হতে পারে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জোরানমথাঙ্গা থেকে চলতি সময়ের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহমা পর্যন্ত প্রতিটি মিজো রাজনীতিবিদ কেন্দ্রের অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে অতিসক্রিয় বিজেপি সরকারের সাথে বারবার বিবাদে লিপ্ত হয়ে দিল্লিকে অনুরোধ করেছেন 'মায়ানমার এবং মণিপুরের সীমান্তের ওপার থেকে আমাদের ভাই ও বোনদের আশ্রয় দেওয়ার জন্যে'(২৪)।

নানান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলে এই দুই সমাজের জাতীয়সত্ত্বা গঠন প্রক্রিয়া ধাক্কা খেলেও, বৃহত্তর জেনেরিক নাগা এবং জো জাতিসত্ত্বার পরিচয় গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ভারত, মায়ানমার এবং বাংলাদেশের মতো উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতি-রাষ্ট্রগুলিতে প্রভূত প্রভাব ফেলেছে। নাগা বা জো'দের মত সীমান্তের দুপাশে থাকা আদিবাসী সমাজ পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বা নানান সামাজিক উৎসবে একসাথে জড়ো হয়, তারা স্বাভাবিকভাবেই সীমান্তের দুপাশে যাতায়াতের নিরবিচ্ছিন্ন অধিকার ধরে রাখার জন্যে প্রাণপনে লড়াই করবে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা জোরদার করতে উদ্যমী হওয়া জাতি-রাষ্ট্র আন্তঃসীমান্ত বিদ্রোহের মুখোমুখি হওয়ার ফলে, তারা এই দাবির জোরদার বিরোধিতা করবে কারণ তারা মনে করে মুক্ত যাতায়াতের ফলে সীমান্তে বিদ্রোহী ঘাঁটি তৈরি হওয়ার সহজ সম্ভাবনা থাকে, তৃতীয়-দেশ থেকে সহজে অস্ত্র পাওয়া সুবিধে হয় এবং মণিপুরের মত পলকা জনসংখ্যা ভারসাম্যওয়ালা রাজ্যে অবৈধ জনসমষ্টির অভিবাসনের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

প্রথমত, জেনেরিক পরিচয় নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়ক্রমধরে বিকশিত হয়েছে; এবং জাতিগত সংহতির পরিচয় তৈরি আর শক্তিশালী হয়েছে পারস্পরিক বিবাহ অনুষ্ঠানে, নানাভাবে আত্মীয়তা বিস্তৃতির মাধ্যমে, উপনিবেশপূর্ব আহোম আর মণিপুর রাজ্য, উপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং উত্তর-উপনিবেশিক জাতি-রাষ্ট্র ভারত, মায়ানমার এবং বাংলাদেশের মতো বহিরাগত রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের কৌমস্মৃতি কণ্ডুয়নের মাধ্যমে। মিজো ন্যাশানাল ফ্রন্টের দু'দশকের বেশি প্রতিরোধ আন্দোলন, ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল/এনএসসিএনএর ছয় দশকের বেশি সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে ভারত মায়ানমার সীমান্তের দুপাশে বসবাস করা নাগা আর জো সমাজ তাদের জাতিসত্ত্বা বাঁচিয়ে রাখতে পারে (তার একটা বড় কারন হল এই গোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশ নেতা ভারতীয় নাগা বা মিজো; তারা সীমান্তের ওপারে

জাতিভাইদের থেকে মূলত আশ্রয় আর অন্য সাহায্য পেয়েছে), বর্তমানে মণিপুরে কুকিরা যে হোমল্যান্ড পাওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছে, বা মায়ানমার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চিন আন্দোলন বা বাংলাদেশে একইভাবে কুকি-চিন লড়াই জেনেরিক পরিচয় তৈরিতে সহায়ক হবে। এই পরিচয়গুলি খুবই তরল এবং প্রায়শই পরিবর্তিত হয় কারণ ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক চাপ বা আর্থ-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতার জন্যে হামেশাই জেনেরিক পরিচয় পরিবর্তনে বাধ্য হয়। হুংশি তাংখুল গোষ্ঠী সম্প্রতি মেইতেই পরিচয়ের জাতিসত্ত্বায় আত্মীভূত হয়েছে।

সমস্ত উখরুল জেলা এবং সেনাপতি জেলায় বসবাস করা খংদেই তাংখুল হুংশি (মাংগাং) গোষ্ঠীর প্রথম জমায়েত গত বছরের ২০ নভেম্বর হুংপুং-এ অনুষ্ঠিত হয়। সেই ধর্মসভার প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে তারা নিজেদের সকলের সামনে 'হুংশি-মাংগাং' সালাই গোষ্ঠী হিসাবে ঘোষণা করে। উদ্বোধনী প্রার্থনা আর নিউম্যান হুংশির হোখারাই তাংখুল প্রথার পরে পরেই শাংভা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান প্র.বনিফেস হুংশির পক্ষ থেকে মানগাং নিংথৌজার অনুরূপ হুংশি সাপের প্রতীকওয়ালা লাল রঙের হুংশি পতাকা তোলা হয়। বনিফেসের বক্তব্য তিনি ১৮ বছরের বেশি সময় নিয়ে হুংশি গোত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার সিদ্ধান্ত হুংশি গোত্রের উদ্ভব হয়েছে খোংদের তিন ছড়িয়ে পড়া ভাই থেকে বড় জনের নাম রিসো খোংরেইহুং/ খোংগ্রেইওয়ো, মেজো হিপাম/হুংপুংহুং এবং ছোটটা মাজহা মেইতেইহুং। এই অনুষ্ঠানে ফেলিক্স এডিসির ডিআই, নিংখানপান হুংশি, হুংশি গোত্রের ইতিহাস শোনান।

খোংদেই ইউনিয়নের ইতিহাস সমিতির আহ্বায়ক, থ. ট্রিজন ইতিহাস সংক্রান্ত মিনিট পড়ে শোনান এবং উক্ত ছোট ছেলে মাজহা মেইতেইহুংএর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি মেইতেই মাংগাংএর অনুপস্থিতিতে মেইতেই ভাষায় আলাপ আলোচনা চালান (২৮)।

ফেসবুকের মেইতেই অভিবাসীরা মেইতেই গোত্রে হুংশিদের যোগদেওয়ায় প্রকাশ্যেই হর্ষ প্রকাশ করেন।

উপজাতির জেনেরিক পরিচয় থেকে উদ্ভুত হয়ে জাতিসত্ত্বাগত পরিচয়ের তরলতা সত্ত্বেও ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বেনিডিক্ট এনডারসনের ভাষায় এই imagined communities গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের সঙ্গে একযোগে বসবাসের মোজেইক ছবিটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত।

সূত্র

B.G Verghese, India's Northeast Resurgent : Ethnicity, Insurgency, Governance, Konark Publishers, Delhi, 1996 & Subir Bhaumik, Insurgent Crossfire : Northeast India, Lancers, Delhi, 1996

Bertil Lintner, Burma in Revolt : Opium & Insurgency Since 1948, Silkworm Books, Bangkok , 1999 and Martin Smith.J.Smith, Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity, Zed Books,

London, 1991

'Operation 1027': A Turning-Point For Myanmar's Resistance Struggle? – The Diplomat ((https://thediplomat.com/2023/10/operation-1027-a-turning -point-for-myanmar's-resistance-struggle/ -- last accessed on 28th January 2024)))

R Shamasatry, Kautilya's Arthasastra, DigitallibraryIndiandia, 1951 & Arthasastra, Kautilya, Penguin Classics, UK & India, 1992

Myanmar rebel alliance agrees to ceasefire with ruling military - ABC News ((https://www.abc.net.au/news/2024-01-13/myanmar-military-and-guerilla-group-agree-to-ceasefire/103316140))

https://carnegieendowment.org/2013/03/07/arc-of-crisis-2.0-pub-51133

James C Scott, The Art of Not Being Governed : An Anarchist History of Upland Southeast Asia", Yale University Press (Agrarian Stidues Series) , USA, 2009.

Anthony D Smith , The Ethnic Origins of Nations, Basil Blackwell, UK, 1986

ix Montserrat Guibernau, " Anthony D Smith on Nations and National Identity : A Critical Assessment", Journal for the Study of Ethnicity & Nationalism, Vol.10, Issue 1-2, Jan'2004

x James C Scott, Ibid

xi The Naga Club memorandum to the Indian Statutory Commission (Simon Commission) submitted on 10 Jan'1929, quoted in Rev V K Nuh, Nagaland Church & Politics, EFICOR publications, Nagaland (India) 1986.

xii ibid

xiii Ibid

xiv Kaka D Iralu, The Naga Saga, ACLS Offset Press , Guwahati, India,2009

xv Subir Bhaumik, "Brothers in Arms", Special Story in " Sunday" (now defunct magazine of Ananda Bazar Group), Kolkata July 1987.

xvi V S Atem in interview to Subir Bhaumik , Bangkok , 12th July 1996

xvii Issac Chisi Swu, Preface to the Manifesto of the National Socialist Council of Nagaland, reproducced in "Nagaland File", Luingam Luithui & Nandita Haksar, Lancers International, Delhi, 1984

xviii Quoted in S C Dev, Nagaland : The Untold Story,Glory Printers, Kolkata, 1988

Xix Dev, Ibid

XX For details of the Naga issue between 1947 to 1956 , read Kaka D Iralu , The Naga Saga (for a 'Naga nationalist' viewpoint; former Nagaland chief minister Hokishe Sema , Emergence of Nagaland (for a moderate pro-India Naga viewpoint) , S C Dev, Nagaland : The Untold Story (for an Indian officialdom viewpoint) and Luingam & Haksar, Nagaland File (for relevant documents) and V K Nuh , Nagaland Church and Politics . For the early period of Naga insurgency, V.K Anand , Conflict in Nagaland.

Xxi The Naga Republic, " A Tribute to Kaito Sukhai (1933-68) in commmoration of his 51st Death Annoiversay, 4 August 2019, Kohima.

Xxii Subir Bhaumik, Troubled Periphery : The Crisis of India's Northeast, Sage (India and UK), Delhi & London, 2009

Xxiii Subir Bhaumik, "Insurgencies in India's Northeast : Conflict, Co-option & Change", No 10, East-West Center (US) monograph, July 2007

Xxiv Times of India, 21st January 2024, " Government Will Scrap Pact on Free Movement with Myanmar : Shah" , ((https://www.msn.com/en-in/news/other/

government-will-scrap-pact-on-free-movement-with-myanmar-amit-shah/ar , last accessed on 28th Jan 2024)

Xxv https://www.aljazeera.com/features/2015/10/1/soaring-divisions-along-india-bangladesh-border-fence (last acccessed on 28 th Jan' 2024)

Xxvi Subir Bhaumik, Troubled Periphery : Crisis of India's Northeast, Sage, Delhi and London 2009

Xxvii Zoramthanga in interview to Subir Bhaumik, 12th November 2023.

Xxviii Imphal Times 20 November 2023

Xxihttps://thewire.in/security/manipur-is-burning-because-of-bjps-divisive-politics-civil-society-

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
অক্ষরযাত্রা প্রকাশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'পলাশীর প্রান্তরে আজ...' শীর্ষকে প্রকাশিত

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং সাজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১-এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বই-এর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা - যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-

অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বাম-আন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী
বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকাকালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা
কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০টা হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্ক-একাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026

ফারসিতে গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে গঞ্জ খেলা ছিল, আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম ছিল গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি জীবধারণের ভিত্তি, যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর; আমরা যারা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন করি, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজে নিজে তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর হকার চাষীর এ এক অনন্ত শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে বুকে, মাথায় বাস করে। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চাই নি, চেয়েছি চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ আজকের বাস্তবতায়, আজকের আলোচনার টেবলে ফেলতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী কী করা উচিৎ নয় এবং কী করা উচিৎ সে আলোচনা আদিত্য নিগমের সঙ্গে এবং খুনি গণহত্যাকারী ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা; দেখেছি কিভাবে হোয়াটসেপের মাধ্যমে মিথ-মিথ্যের পাঠক্রম ছড়ায়; একই সঙ্গে দেখছি কিভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবিরা বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়ে কাজ করে; একই সঙ্গে আমরা বুঝচেয়েছি বাংলার নৌকোকে এবং উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি; চলতি সংখ্যায় আমরা মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছি অভিজ্ঞ সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে।

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)'
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়_মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর

জ্ঞা ন গ ঞ্জ